তিন গোয়েন্দা সিরিজ

ভীষণ অরণ্য ১

রকিব হাসান

স্বীকারোক্তি:

বাংলা e-book-এর পাঠকেরা ছড়িয়ে আছেন বিশ্বের নানা প্রান্তে এবং সব জায়গার ইন্টারনেট কানেকশনের গতি সমান নয়। তাই চেষ্টা করতে হয়েছে ফাইলের সাইজ যথা সম্ভব ছোট রাখার। ফলে অনিবার্য ভাবে কমাতে হয়েছে ছবির Resolution. পাঠকের এই অসুবিধার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

Best Viewed at 150%

Scanned by: Shabab Mustafa

Send your feedback at:
Shabab.mustafa@gmail.com

ভীষণ অরণ্য ১

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট, ১৯৮৮

'হ্যাঁ, পৃথিবীর সব চেয়ে বড় নদী দেখবে,' গল্প করছে কুইটো হোটেলের মালিক ডেবিটো ফেরিও। 'দেখবে, পৃথিবীর সব চেয়ে বড় জঙ্গল। বেশির ভাগ জায়গাতেই এখনও সভ্য মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি। খাবারের গুদাম বলা চলে ওটাকে। একদিন সারা দুনিয়াকে খাওয়াবে ওই আমাজন…'

লোকটার বকবক ভাল লাগছে না কিশোর পাশার। তাকে থামানোর জন্যে স্টাফ করা মস্ত এক কুমির দেখিয়ে বলল, 'এত বড় কুমির সত্যি আছে আমাজানে? আমি তো জানতাম…'

'এর চেয়ে বড়ও আছে। জানোয়ার চাও তো? পাবে। এত আছে ওখানে, নিয়ে কূল করতে পারবে না। পৃথিবীর অন্য সব জানোয়ার এক করলেও এত রকমের হবে না। ভুল বললাম, মিস্টার আমান?' মুসার বাবাকে সাক্ষি মানল ফেরিও।

জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান মিস্টার আমানের। ভাল শিকারী। হলিউডে এক সিনেমা কোম্পানিতে খুব উঁচু দরের টেকনিশিয়ানের কাজ করেন। কিন্তু সুযোগ পেলেই অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়েন—চলে যান শিকারে, কিংবা সাগর, হ্রদে মাছ ধরতে। কি শিকার করেননি তিনি? মেকসিকোর কলোরাডোতে পার্বত্য সিংহ, আলাসকায় গ্রিজলী ভালুক, এমনকি একবার তিমি শিকারীদের সঙ্গে গিয়ে তিমিও ধরেছেন। আফ্রিকার হাতি-মোষ আর চিতা-সিংহ তো মেরেছেনই।

'কেউ জানে না,' ঘুরিয়ে বললেন তিনি, 'কত রকমের জানোয়ার আছে ওখানে। ওই যে বললেন, বেশির ভাগ জায়গাতে এখনও যেতে পারেনি সভ্য মানুষ। তাই ঠিক করেছি, নতুন জায়গায় যাব আমরা। যেখানে আগে কেউ যায়নি। প্যাসটাজা নদীর কথাই ধরুন।'

'প্যাসটাজা!' আঁতকে উঠল ফেরিও। 'বলেন কি, সাহেব? মারা পড়বেন, মারা পড়বেন। অ্যানডোয়াজের ওধারেই যেতে পারেনি কেউ। গত বছর দু-জন শ্বেতাঙ্গ চেষ্টা করেছিল। পারেনি। ইণ্ডিয়ানরা ধরতে পারলে,' হাত তুলে একটা জিনিস দেখাল সে। 'ও-রকম করে ছেড়ে দেবে।'

হোটেলের লবিতে বসে কথা হচ্ছে। ফায়ারপ্লেসের ওপরে তাকে রাখা আছে অদ্ভুত জিনিসটা। মানুষের একটা সঙ্কুচিত মাথা, কমলার সমান।

কাছে গিয়ে জিনিসটা ভালমত দেখল মুসা আমান। ছোঁয়ার সাহস হলো না। 'জিভারো ইণ্ডিয়ানদের কাজ?'

'হ্যাঁ,' মাথা নোয়াল ফেরিও। 'তবে তোমরা যেখানে গিয়েছিলে, ওখানকার

জিভারো নয়, ওরা অনেক ভব। ফাঁকিফুঁকি দিয়ে ছুটে এসেছ। এখন যেখানে যেতে চাইছ, ওরা ধরতে পারলে…'

'ছাড়বে না বলছেন?' একটা রেফারেন্স বই পড়ছিল রবিন মিলফোর্ড, মুখ তুলল। 'কিন্তু আমি যদ্দূর জানি, আজকাল আর বিদেশীদের মাথা কেটে ট্রফি বানায় না ওরা। শুধু শত্রু আর আত্মীয় যারা মারা যায়…'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল ফেরিও। 'জিভারো ব্যাটাদের আমি বিশ্বাস করি না। তোমাদেরকেই যদি শত্রু ভেবে বসে?'

অকাট্য যুক্তি। চুপ হয়ে গেল রবিন।

কিশোর তাকিয়ে আছে মাথাটার দিকে। জিভারোরা ধরতে পারলে কি করবে, আপাতত সে-সব নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই, সে ভাবছে অন্য কথা। রকি বীচ মিউজিয়ামে ওই জিনিস নেই। ওরা পেলে ভাল দাম দেবে ওরা। ব্যবসা করতে যখন নেমেছে, সব কিছুকেই ব্যবসায়ীর চোখে দেখা উচিত। জন্তু-জানোয়ার ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করবে চিড়িয়াখানা, সার্কাস পার্টি আর জানোয়ার পোষে এমন সব সংগঠনে। সেই সঙ্গে দু-চারটে অন্য জিনিস—যেগুলোতে টাকা আসবে—নিতে ক্ষতি কি? 'ওটা বিক্রি করবেন?'

দ্বিধায় পড়ে গেল ফেরিও।

তাড়াতাড়ি বললেন মিস্টার আমান, 'যা বলেছ বলেছ, আর মুখেও এনো না। ওরকম একটা অফার দিয়েছ শুনলেই ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে ভরবে পুলিশ। মাথা বেচাকেনার ব্যাপারে আইনের খুব কড়াকড়ি চলছে এখানে। যারা আগে নিয়ে ফেলেছে, ফেলেছে। তবে ছাগল কিংবা ঘোড়ার চামড়ায় তৈরি নকল জিনিস নিতে পারো।'

রহস্যময় হাসি হাসল ফেরিও। 'আমি কিন্তু বলে দিতে পারি, আসল মাথা কোথায় পাবে।'

'কোথায়?' সামনে ঝুঁকল কিশোর।

'জিভারো ইনডিয়ানদের কাছে।'

'ওদের কাছ থেকে আনলে আইন কিছু বলবে না?'

'না। যদি মাথাটা ইনডিয়ানদের কারও হয়।'

'হুঁ, অনেক আইনেই গলদ থাকে,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'যাকগে, মাথা পাওয়া দিয়ে কথা আমার, পেলেই হলো, যেখান থেকেই হোক।'

'ওখানে না গেলেই কি নয়?' হাত নাড়ল মুসা, অস্বস্তি বোধ করছে। 'বাবা, আমাদের তো যাওয়ার কথা ছিল আমাজনে। প্যাসটাজায় কেন আবার?'

জবাবটা দিল রবিন, 'প্যাসটাজা নদী আমাজনের প্রধান পানির উৎসগুলোর একটা। আমাজন কোন মূল নদী নয়, অনেকগুলো জলধারার মিশ্রণ। ওগুলোর জন্ম হয়েছে আবার অ্যাণ্ডিজ পর্বতমালার বরফগলা পানি থেকে। প্যাসটাজা তারই একটা। এবং এটার ব্যাপারে ভৌগোলিকদের আগ্রহও খুব। কারণ এর বেশির ভাগ

অঞ্চলই ম্যাপে নেই, চার্ট করা যায়নি।'

'কাজেই এমন একটা জায়গা দেখার লোভ ছাড়ি কি করে?' যোগ করলেন মিস্টার আমান। 'কেন, তোমার ভয় করছে?' ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন।

'ভয়?' ট্রফিটার দিকে আরেকবার তাকাল মুসা। 'তা-তো করবেই। মাথাটা আলাদা করে দিলে তো গেলাম।'

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল হোটেলের একজন কর্মচারী। হাতে একটা খাম। বাড়িয়ে দিল।

খামটা নিয়ে ছিঁড়লেন মিস্টার আমান। ভাঁজ করা ছোট এক টুকরো কাগজ বের করলেন। টেলিগ্রাম। পড়তে পড়তে ভুরু কুঁচকে গেল। বিশ্বাস করতে পারছেন না যেন। দু-বার, তিনবার পড়লেন লেখাটা।

'কি?' এগিয়ে এল কিশোর। 'খারাপ খবর?'

'অ্যাঁ? না,' হঠাৎ হেসে ফেললেন তিনি। 'আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছে কেউ।'

'দেখি তো।' কাগজটা নিয়ে পড়ল কিশোর। লেখা রয়েছে ঃ

রাফাত আমান,
কুইটো হোটেল,
কুইটো,
ইকোয়াডর।
আমাজন খুব খারাপ জায়গা দূরে থাকলেই ভাল করবেন
বাড়ির অবস্থা ভাল নয় জলদি ফিরে যান।
কে পাঠিয়েছে নাম নেই।
টেলিগ্রামটা এসেছে লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে।

দুই

'কে পাঠাল?' কাগজটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর।

'হয়তো অ্যানিমেল ক্লাবের কেউ, একটু মজা করতে চেয়েছে,' বললেন বটে মিস্টার আমান, কিন্তু নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনালো কথাটা।

'বাবা, বাড়িতে কিছু হয়নি তো?' মুসা বলল।

'নাআহ্। তাহলে তোমার মা টেলিগ্রাম করত।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর, কোন ব্যাপারে গভীর ভাবে চিন্তা করার সময় এটা করে সে। 'মনে হচ্ছে, জানোয়ার ধরতে এসেও রহস্যে জড়াতে যাচ্ছি আমরা। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে কার এই আক্রোশ? আমরা আমাজনে গেলে কার কি ক্ষতি? কে থামাতে চায়?'

'কি জানি,' বললেন মিস্টার আমান। ফেলে দাও। সামান্য ব্যাপার। টেলিগ্রামে

নাম লেখার যার সাহস নেই, সে আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

'খোঁজ তো করতে পারি? টেলিগ্রাম অফিসে নিশ্চয় নাম-ঠিকানা লিখেছে,' রবিন বলল, 'ফর্মে।'

'তা-তো নিতেই পারি,' কিশোর জবাব দিল। 'লাভ কি হবে? তোমার কি ধারণা, যে লোক এভাবে লুকোচুরি খেলতে চায় সে আসল নাম লিখবে?'

ছেলেদের উদ্বিগ্ন ভাব লক্ষ করলেন মিস্টার আমান। 'খামোকা ভাবছ। এটা কোনও ব্যাপার? কেউ রসিকতা করেছে আমাদের সঙ্গে। হ্যাঁ, কাল খুব সকালে রওনা হব। ভোর রাতে উঠতে হবে আমাদের। প্লেনটা ঠিক হয়েছে কিনা কে জানে।'

'গিয়ে দেখে আসব?' প্রস্তাব দিল মুসা।

'মন্দ বলোনি,' কিশোর সায় জানাল।

'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি,' বললেন মিস্টার আমান।

'তুমি শুয়ে থাকো, বাবা, আমরাই পারব। রবিন, যাবে?'

'আমি? নাহ্ তোমরাই যাও। ততক্ষণে আমি এই চ্যাপটারটা শেষ করে ফেলি,' রেফারেন্স বই খুলে বসল আবার রবিন।

হোটেল থেকে বেরোল কিশোর আর মুসা। প্লাজা ইনডিপেনডেনসিয়ায় গানের জলসা হচ্ছে, ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে একটা দল। রাস্তার ওপাশের বিশাল গির্জা আর পাদ্রীর প্রাসাদে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে ঢোলের দ্রিম দ্রিম। প্লাজায় লোক গিজগিজ করছে। বেশির ভাগই ধোপদুরস্ত পোশাক পরা নাগরিক, স্পেন থেকে এসেছিল তাদের পূর্বপুরুষরা। বেশ কিছু স্থানীয় ইণ্ডিয়ানও রয়েছে তাদের মাঝে, ছড়ানো কানাওয়ালা চ্যাপ্টা হ্যাট মাথায়, গায়ে জড়ানো কম্বলের মত পোশাক—পনচো।

রহস্যঘেরা অতি সুন্দর একটা শহর, ভাবল কিশোর। পর্বতের কোলে বিশাল উপত্যকায় শুয়ে রয়েছে যেন। চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করছে পর্বতের বরফে ছাওয়া চূড়া। কুইটোর লোকেরা যে বলে, *কুইটো থেকে স্বর্গ এত কাছে, হাত বাড়ালেই নাগাল পাওয়া যায়,* ভুল বলে না।

খানিক হেঁটেই হাঁপিয়ে পড়ল দুই গোয়েন্দা। গতি কমাতে বাধ্য হলো। সমুদ্র সমতল থেকে সাড়ে নয় হাজার ফুট ওপরে রয়েছে ওরা, তাই পরিশ্রম বেশি লাগছে। হাত বাড়ালেই স্বর্গ নাগাল পাওয়া যায় বলার আরেকটা কারণ অনেক উঁচুতে এই শহর। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু শহরগুলোর একটা। কিন্তু উচ্চতার তুলনায় শীত বেশি নয়, কারণ, শহরের ঠিক গা ঘেঁষে চলে গেছে বিষুবরেখা, তবে যেটুকু শীত আছে তাতেই হাড় কাঁপিয়ে ছাড়ে। ওভারকোটের বোতাম এঁটে দিল কিশোর। উজ্জ্বল আলোকিত প্লাজা থেকে নেমে এল পুরানো শহরের সরু অন্ধকার গলিতে।

খুব সাবধানে হাঁটতে হচ্ছে। খোয়া বিছানো পথের দু-ধারে সারি সারি পুরানো বাড়িঘর, রোদে শুকানো ইঁটে তৈরি। মাথার লাল টালির ছাত কোনকালে ঢেকে

গেছে সবুজ শ্যাওলা আর লতাপাতায়, দু-দিক থেকে এসে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে প্রাকৃতিক বানিয়ে দিয়েছে। ফলে মনে হয় একটা সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে হাঁটছে।

পথের মাঝে মাঝে আলো আরও ঘন করেছে অন্ধকারকে। বাড়িঘরের ছায়াগুলো নিঃশব্দ পায়ে সরে যাচ্ছে যেন ওদের পাশ দিয়ে। গা ছমছমে পরিবেশ।

নিঃশব্দতার মাঝে তাই শব্দটা বড় বেশি কানে বাজছে কিশোরের, অনেকক্ষণ থেকেই পাচ্ছে। জুতোর মচমচ। শুরুতে বিশেষ গুরুত্ব দিল না। কিন্তু ভেনিজুয়েলা রোড থেকে ডানে মোড় নিয়ে সুক্রিতে পড়ার পরও যখন শব্দটা আসতেই থাকল, মনযোগ না দিয়ে আর পারল না। বাঁয়ে মোড় নিয়ে পিচিনচা গলিতে পড়ল। শব্দের কোন ব্যতিক্রম নেই, আসছে।

মুসাও শুনতে পাচ্ছে জুতোর শব্দ। তার গায়ে কনুই দিয়ে আলতো গুঁতো মেরে ইশারা করল কিশোর, পাশে সরে দাঁড়িয়ে গেল একটা বাড়ির ছায়ায়। মুসা দাঁড়াল তার গা ঘেঁষে।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল জুতোর আওয়াজ।

কোন সন্দেহ নেই, অনুসরণই করছে।

ছায়া থেকে বেরিয়ে আবার এগোল দুই গোয়েন্দা। আবার শুরু হলো অনুসরণ। আরও শ-খানেক গজ পর আরেকটা বাড়ির সামনে এসে থামল দু-জনে। দরজার সামনেটা অন্ধকারে ঢাকা। পকেট থেকে টর্চ বের করে সদর দরজার কপালে বসানো নেমপ্লেটের ওপর আলো ফেলল কিশোর। হ্যাঁ, এই বাড়িটাই। সকালে এখানেই এসেছিল। এক আইরিশম্যান থাকে, পাইক জোনস তার নাম। কুইটোর লোকেরা বলে 'পাগলা পাইক'। প্রায়ই নাকি বিমান নিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে এই খেপা বৈমানিক। বাড়িয়ে বলাটা অবশ্য লোকের স্বভাব, সে যে কোন দেশেরই হোক না কেন।

পেছনে এগিয়ে আসছে জুতোর মচমচ। এলোমেলো পদশব্দ, থামবে কিনা ভাবছে বোধহয়, দ্বিধায় ভুগছে। থামল একবার, এগোল···আবার থামল···আবার এগিয়ে এসে একেবারে গোয়েন্দাদের পেছনে দাঁড়াল।

হঠাৎ ঘুরে লোকটার মুখে আলো ফেলল কিশোর।

ইকোয়াডরিয়ান নয়। হোঁতকা, বিশালদেহী। ল্যাটিন আমেরিকার লোকেরা সাধারণত হালকা-পাতলা ছোটখাটো হয়। ইনডিয়ানরাও হালকা-পাতলা, তবে ল্যাটিনদের মত ছোট নয়, আর চেহারা বেশ কর্কশ। এই লোকটা তার কোনটাই নয়। কিশোরের মনে হলো, এককালে মুষ্টিযোদ্ধা ছিল, কিংবা শিকাগো শহরের গুণ্ডা-সর্দার। চোখে আলো পড়ায় বিকৃত হয়ে গেল নিষ্ঠুর চেহারাটা। চমকে যাওয়া বাঘের চোখের মত জ্বলছে রক্তলাল দুই চোখ।

মুসার ধারণা হলো, আমাজন জঙ্গলের নরমুণ্ড শিকারীদের চেহারাও এত ভয়ঙ্কর নয়।

'আমাদের পেছনে আসছেন কেন?' জোর করে কণ্ঠস্বর ঠিক রাখল কিশোর।

চোখ মিটমিট করল লোকটা। 'তোমাদের পেছনে আসব কেন? হাঁটতে বেরিয়েছি।'

'আমরা যে যে পথে যাচ্ছি ঠিক সে-পথেই হাঁটা লাগছে আপনার? আর জায়গা নেই?' ভয়ে ভয়ে রয়েছে কিশোর, মেরে না বসে ডাকাতটা।

'তোমাদের পথেই এসেছি কেন ভাবছ?'

'ভাবছি না, জানি। যা জুতো পরেছেন না···'

'মাশাআল্লাহ।' কিশোরের বাক্যটা শেষ করল মুসা। 'দশ মাইলের মধ্যে মরাও জেগে যাবে। আপনার কানে খারাপ লাগে না?'

'খারাপ? কেন? খোয়ায় হাঁটলে সব চামড়ার জুতোই মচমচ করে, কম আর বেশি।'

'তবে আপনারগুলো মিউজিয়ামে রাখার মত।'

'অনুসরণ করছিলেন কেন?' কিশোর বলল। 'ছিনতাই-টিনতাইয়ের ইচ্ছে?'

জ্বলে উঠল লোকটার চোখ। হাত তুলতে গিয়েও কি ভেবে তুলল না। বোধহয় ভাবল, দুটো ছেলেকে এক সঙ্গে কাবু করতে পারবে না। নিগ্রো ছেলেটা আবার গায়েগতরে বেশ তাগড়া। ওকে কাহিল করতে তার মত ফাইটারেরও বেগ পেতে হবে। তাছাড়া এখানে ঘনবসতি। চেঁচামেচি শুনে লোক বেরিয়ে আসবে, আর এলে ছেলেদের পক্ষ যে নেবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে?

হাসল লোকটা। জোর করে হাসছে বোঝাই যায়। 'ঠিকই বলেছ, তোমাদের পিছুই নিয়েছি। তবে চুরি-ডাকাতির জন্যে নয়। দেখলাম তোমরা বিদেশী, আমিও বিদেশী। এখানে তো ইংরেজি জানা লোকের অভাব। তোমরা হয়তো জানো, তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছি, স্যানটো ডোমিংগো গির্জাটা কোথায়। আজ রোববার, সারাদিন সময় পাইনি। ভাবলাম, শেষ কয়েকটা মোম জ্বেলে দিয়ে আসি,' আকাশের দিকে রক্তলাল চোখ তুলল সে। 'ঈশ্বর তো দেখছেন।'

'ভূতের মুখে রাম নাম,' বাংলায় বিড়বিড় করল কিশোর। ইংরেজিতে বলল, 'ঠিক জানি না কোনদিকে। ওদিকে হবে হয়তো, ফ্লোরেস রোডের মোড়ে। ঘণ্টা শুনেছিলাম।'

'ধন্যবাদ,' ভদ্রভাবে বলার চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু স্বভাব-কর্কশ কণ্ঠ কত আর মোলায়েম করা যায়? 'আবার দেখা হবে।'

'আমার কোন ইচ্ছে নেই,' এই কথাটাও বাংলায় বলে ঘুরল কিশোর। জোনসের দরজায় থাবা দিল।

দরজা খুলল তরুণ পাইলট। ছেলেদেরকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসাল বসার ঘরে। ফায়ার প্লেসে গনগনে আগুন। উষ্ণ বাতাস। খুব আরাম।

'কি ব্যাপার? কিছু হয়েছে নাকি?' ছেলেদের মুখ দেখেই কিছুটা আন্দাজ করে নিয়েছে জোনস। 'চোরছ্যাঁচোড় লেগেছিল পেছনে?'

'কি করে জানলেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

'জানা লাগে না। এখানে ওদের অভাব নেই,' হাসল বৈমানিক। 'বিদেশী দেখলেই পেছনে লাগে।'

চেহারা যাই হোক, হাসিটা খুব সুন্দর লোকটার।

খুলে বলল সব কিশোর।

মুসা বলে দিল রহস্যময় টেলিগ্রামের কথাটা। বিমান ভাড়া করতে গিয়ে মাত্র সেদিনই পরিচয় হয়েছে জোনসের সঙ্গে। কেন তার কাছে এত কথা বলল, ওরা জানে না। বোধহয় তার হাসিটাই দ্রুত আপন করে নেয় মানুষকে।

'হুঁ,' সব শুনে মাথা দোলাল জোনস। 'কিন্তু দুটো ব্যাপারকে এক করছ কেন?'

'করছি এ-জন্যে,' কিশোর বলল, 'লোকটা ডাকাত হলে ডাকাতি করত।'

'হয়তো শেষ মুহূর্তে ঘাবড়ে গেছে।'

'উহু, হতেই পারে না। ঘুসি মারলেই চিত হয়ে যেতাম আমরা। চুরি-ডাকাতির জন্যে নয়, অন্য কোন ব্যাপার আছে।'

'আচ্ছা,' জিজ্ঞেস করল জোনস, 'লস অ্যাঞ্জেলেসে কি তোমাদের কোন শত্রু আছে?'

'যে কাজ করি, থাকতেই পারে…'

'কি কাজ করো?'

'শখের গোয়েন্দাগিরি। তিন গোয়েন্দা আমরা।'

'বাহ্, শুনে তো দারুণ মনে হচ্ছে,' মিটিমিটি হাসছে বৈমানিকের চোখ দুটো। 'তা খুলেই বলো না। দাঁড়াও, কফি করে নিয়ে আসি। আপত্তি আছে?'

'না,' মুসা বলল। 'যা ঠাণ্ডার মধ্যে এসেছি। একটু কড়া হলে ভালই হয়।'

কফি খেতে খেতে কথা হলো।

সংক্ষেপে তাদের কথা জানাল কিশোর।

'চমৎকার! দারুণ! ইস্, এখানে যদি থাকতে তোমরা, শিওর তোমাদের দলে যোগ দিয়ে ফেলতাম, ঠেলেও সরাতে পারতে না।…আচ্ছা, কিশোর, ওই লোকটা পিছু নিল কেন কিছু ভেবেছ?' সামান্য আলাপেই গোয়েন্দাগিরির শখটা সংক্রমিত হয়েছে জোনসের মাঝে।

'বুঝতে পারছি না। তবে, লস অ্যাঞ্জেলেসে আরেকজন জানোয়ার ব্যবসায়ী আছে। আমরা ব্যবসা খুলতে যাচ্ছি শুনে আমার চাচার সঙ্গে দেখা করেছিল। মুসার বাবার সঙ্গেও। এই ব্যবসা ভাল না, হেন না তেন না বলে অনেক রকমে বোঝাতে চেয়েছিল। যাতে আমরা এই ব্যবসায় না নামি।'

'তার কি অসুবিধে?'

'প্রতিযোগী হয়ে যাব না?' জবাব দিল মুসা। 'এমনিতেই ওর ব্যবসা মন্দা। আমরা নামলে হয়তো ফেলই মারবে।'

'হুঁ, তা-ও তো কথা।'

'হ্যাঁ, প্লেনের কি হলো?' আসল কথায় এল কিশোর।

'কাল সকালেই রওনা হতে চাও?'

'নিশ্চয়। ব্রেক ঠিক হয়েছে?'

'ভালভাবে করতে সময় লাগবে। তবে কাজ চালানোর মত হয়েছে।'

'চলবে তো?'

'তা চলবে। অন্তত আমি চালাতে পারব।'

বিশ্বাস করল কিশোর। অল্পক্ষণের পরিচয়েই লোকটাকে অনেকখানি চিনে ফেলেছে। জোনস যখন পারবে বলছে, পারবে।

'ঠিক আছে,' উঠল কিশোর। 'কাল ভোরে মাঠে হাজির থাকব। খুব ভোরে।'

দরজার কাছে দুজনকে এগিয়ে দিয়ে গেল জোনস। বলল, 'যেতে পারবে? নাকি আমি আসব?'

'আরে পারব, পারব,' হেসে বলল মুসা। হাতের মুঠো পাকিয়ে দেখাল, 'ও দশটা দিলে আমরা দুজন দুটো তো দিতে পারব। এত সহজে কাবু হব না। চলি। গুড বাই।'

নিরাপদেই হোটেলে ফিরে এল দুজনে।

তিন

'সবুজ নরকে যাওয়ার জন্যে সবাই তৈরি?' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল জোনস। 'তাহলে আসুন, উঠুন আমার পক্ষিরাজে,' আদর করে চার সীটের বোনানজা বিমানটার গায়ে চাপড় মারল সে।

উঠল যাত্রীরা। জোনসের পাশে মিস্টার আমান।

পেছনে গাদাগাদি করে বসল তিন গোয়েন্দা, দুজনের জায়গায় তিনজন। দুটো সীটের মাঝে হাতল নেই বলেই বসতে পারল। তাদের মালপত্র আর রাইফেল-বন্দুক তোলা হয়েছে লাগেজ কম্পার্টমেন্টে।

'অসুবিধে হবে না তো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'নাহ্,' এঞ্জিন স্টার্ট দিল জোনস। 'তোমরা তো মোটে তিনজন, তা-ও ছেলেমানুষ। ওই জায়গায় চার-চারজন পূর্ণবয়স্ক ইনডিয়ানকে তুলেছি আমি।'

'চারজন! জায়গা কোথায়?'

'মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে একজন। তার ওপর পা তুলে দিয়ে সীটে বসেছে তিনজন। সামনের সীটেও দুজন ছিল।'

'উড়তে অসুবিধে হয়নি?'

'উড়ব তো আমি। আমার ইচ্ছে না প্লেনের ইচ্ছে?'

জোনসের ইচ্ছেতেই যে প্লেনটা চলে, সেটা বোঝা গেল খানিক পরেই। কেন তাকে লোকে পাগলা পাইক বলে, তারও প্রমাণ মিলল।

ঝুলে পড়তে চায়। মাল বেশি বোঝাই করে ফেলেছে, সেটা একটা কারণ। আরেকটা কারণ, সমুদ্র সমতল থেকে এত উঁচুতে বাতাস খুবই পাতলা, ঠিকমত কামড় বসাতে পারছে না প্রপেলার।

মাতলামি সামান্য কমলো। ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে শুরু করল প্লেন।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ওঠার রেট কি আপনার?'

'সী লেভেলে মিনিটে নয় শো ফুট,' জবাব দিল জোনস। 'কিন্তু এখানে বড় জোর পাঁচশো।'

'সার্ভিস সিলিং?' আকাশ ফুঁড়ে ওঠা বরফে ছাওয়া পর্বতের চূড়ার দিকে চেয়ে আছে কিশোর, দৃষ্টিতে ভয় মেশানো বিস্ময়।

'সতেরো হাজার ফুট। নেহায়েত মন্দ না, কি বলো?'

'কিন্তু ওই চূড়া তো পেরোতে পারবেন না,' সামনে হাত তুলে দেখাল কিশোর। দুই হাঁটুর ওপর বিছানো ম্যাপের দিকে তাকাল। তেরোটা বিশাল আগ্নেয়গিরি মাথা চাড়া দিয়ে আছে ইকোয়াডরে। কয়েকটা প্রায় গায়ে গায়ে ঠেকে গিয়ে ঘিরে রেখেছে কুইটোকে। ওই তো কোটোপ্যাক্সি, পৃথিবীর বৃহত্তম জীবন্ত আগ্নেয়গিরি, উঠে গেছে উনিশ হাজার ফুট উঁচুতে। কেইয়ামবি আর অ্যানটিসানার চূড়াও ওটার চেয়ে খুব একটা কম যায় না।

'পেরোতে যাচ্ছে কে?' বলল জোনস, 'গিরিপথের মাঝখান দিয়ে চলে যাব।'

'গিরিপথ?'

'ওই হলো। দুই পর্বতের মাঝের পথকেই তো গিরিপথ বলে? ঠিক আছে, শুধরে দিচ্ছি। আমরা যাব গিরি-আকাশের মধ্যে দিয়ে। নিচে হাঁটাপথ নেই ওখানটায়।'

'কিন্তু উত্তরে যাচ্ছেন কেন?'

'তোমাদেরকে বিষুবরেখা দেখানোর জন্যে। ওই যে স্তম্ভটা দেখছ? উনিশশো ছত্রিশ সালে একটা ফরাসী জরিপকারী দল বসিয়েছিল ওটা, বিষুবরেখার নির্দেশক। বুড়ো পৃথিবীটাকে দু-ভাগে ভাগ করার জন্যে বিজ্ঞানীদের কতই না চেষ্টা, আহা! আমরা এখন রয়েছি উত্তর গোলার্ধে,' বলেই শাঁই করে নাক ঘুরিয়ে প্লেনটাকে নিয়ে চলল স্তম্ভটার দিকে। পেরিয়ে এল ওটা। 'এই ছিলাম উত্তর গোলার্ধে, চলে এলাম দক্ষিণে। মজার ব্যাপার না?'

ভীষণ ঠাণ্ডা। ফুঁ দিয়ে হাতের তালু গরম করতে করতে মুসা বলল, 'বিষুবরেখা না ছাই। আমার তো মনে হচ্ছে বিষুবমেরুতে ঢুকেছি।'

'বিষুবমেরু বলে কিছু নেই,' গম্ভীর হয়ে বলল রবিন।

'না থাকলে কি? নাম একটা বানিয়ে নিলেই হলো।'

'ওটা কোন রাস্তা?' নিচে দেখিয়ে বললেন মিস্টার আমান। 'প্যান-আমেরিকান হাইওয়ে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল জোনস।

সড়কটার ডাকনাম ওয়ানডার রোড বা বিস্ময় সড়ক, অনেক লম্বা, সেই আলাস্কা থেকে শুরু করে শেষ হয়েছে গিয়ে প্যাটাগোনিয়ায়।

'ইস্,' মুসা বলল, 'ওই পথে যদি যেতে পারতাম একবার।'

'পারবে পারবে,' আশ্বাস দিলেন তার বাবা। 'এখন যেখানে যাচ্ছি সেখানেই যেতে পারবে ভেবেছিলে কোন দিন? কিন্তু যাচ্ছি তো। এই নতুন ব্যবসায় যখন নেমেছি, দুনিয়ার অনেক জায়গাই দেখতে পাবে। নেমেছিই তো সেজন্যে। পয়সাও এল, খরচও পোষাল, জায়গাও দেখা হলো।'

তা ঠিক, মনে মনে স্বীকার করল কিশোর, এক ঢিলে তিন পাখি। জন্তু-জানোয়ার ধরাটা একটা ছুতো আসলে, দেশভ্রমণের জন্যেই এই ব্যবসার ফন্দি এঁটেছে দুই বুড়ো—তার চাচা আর মুসার বাবা। কিন্তু *খুবই দুঃখের বিষয়*, প্রথম অভিযানেই আসতে পারেননি রাশেদ পাশা। ইয়ার্ডে নাকি জরুরী কাজ, রিও ডি জেনিরো থেকেই তাঁকে বগলদাবা করে নিয়ে গেছেন মেরিচাচী, রকি বীচে। কিশোরকে আসতে দিয়েছেন শুধু মুসার বাবা সঙ্গে আছেন বলেই। তা-ও হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন, তিনটে ছেলের একটারও যদি কোন কারণে একটু চামড়া ছিলে, দুই মিনসের সারা শরীরের চামড়া ছিলবেন তিনি। বুড়োদের 'ভীমরতিতে' মুসার মায়েরও যথেষ্ট আপত্তি ছিল, কিন্তু মেরিচাচীর ওই সাংঘাতিক হুমকির পর আর কিছু বলার প্রয়োজন মনে করলেন না। আর রবিনের বাবা-মা আপত্তিই করেননি। তাঁদের কথা, ছেলে হয়ে যখন জন্মেছে, সারা জীবন কোলে বসিয়ে তো আর রাখা যাবে না। তার চেয়ে এখন থেকেই যাক যেখানে খুশি, সাহস বাড়ুক ছেলের, বেঁচে ফিরে আসতে পারলেই ওঁরা খুশি।

রাশেদ চাচা, মেরিচাচী, মুসার মা, রবিনের বাবা-মা, জিনার বাবা-মা আর রাফিয়ান এক সঙ্গেই চলে গেছে লস অ্যাঞ্জেলেসে। এই অভিযানে আসার খুব ইচ্ছে ছিল জিনার, কিন্তু তার বাবা-মা রাজি হননি।

'পথটা কি একটানা গেছে, না ভেঙে ভেঙে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'তিনটে ভাঙা আছে,' রবিন বলল। 'তবে অসুবিধে নেই। ভাঙাগুলো জোড়া দিয়েছে সংক্ষিপ্ত নৌ কিংবা রেলপথ। গাড়ি সঙ্গে থাকলেও ঝামেলা হবে না। জাহাজে কিংবা রেলগাড়িতে তুলে সহজেই পার করে নিতে পারবে ওসব জায়গা।'

'সত্যি, আশ্চর্য এক সড়ক,' অনেক নিচে আঁকাবাঁকা ফিতের মত পথটার দিকে তাকিয়ে বললেন মিস্টার আমান। 'দুই আমেরিকাকে জোড়া দিয়েছে।'

'যত যা-ই বলুন, আকাশপথের জুড়ি নেই,' আদর করে কন্ট্রোল প্যানেলে হাত রাখল জোনস। 'শুধু আমেরিকা কেন, সারা পৃথিবীকেই তো জোড়া দিয়ে দিয়েছে বিমান।'

প্রতিবাদ করলেন না মিস্টার আমান। পৃথিবী জোড়া দেয়ার ব্যাপারে নৌ পথেরও কৃতিত্ব কম নয়, কিন্তু সে-কথা তুললেন না, খেপে যাবে পাগলা পাইক। বিমান ছাড়া আর কিছু বোঝে না সে। দুর্গম এই পাহাড়ী অঞ্চলে বিমান চালাচ্ছে

পাঁচ বছর ধরে। দূরদূরান্তে চলে যায়, কোন বাধাই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি আজ পর্যন্ত। কুইটো থেকে উপকূলের গোয়েইয়াকুইলে-ই যেতে চায় না অনেক বৈমানিক, কিন্তু জোনসের কাছে ওটা ছেলেখেলা। মনের আনন্দে অ্যান্ডিজ পর্বতমালা পেরিয়ে সীমাহীন জঙ্গল ছাড়িয়ে তারও পরের দুর্গম অঞ্চলে চলে যায় সে, যেখানে রয়েছে অগুনতি রবার বাগান, যেখান থেকে জোগাড় হয় কুইনিন। ভেবে অবাক হতে হয়, আজতক একটা দুর্ঘটনা ঘটায়নি সে। আকাশছোঁয়া পাহাড়ের দেয়াল, বরফে ছাওয়া পর্বত-চূড়া, ভীষণ জঙ্গল, প্রতিকূল আবহাওয়া কোন কিছুই পরাজিত করতে পারেনি তাকে, সব কিছুই হার মেনে পথ ছেড়ে দিয়েছে। তার এই রেকর্ড এ-অঞ্চলে এখনও কেউ ভাঙতে পারেনি।

এসব কথা তিন গোয়েন্দাও জানে, মিস্টার আমানই বলেছেন। দেখা যাক এবার কি খেল দেখায়, ভাবল সবাই।

সামনের পাহাড়ের দেয়ালে একটা সরু ফাটল দেখা গেল। ওটাই বোধহয় জোনসের গিরি-আকাশ। কি একখান জায়গা। দুই ধারে দুই পাহাড়ের চূড়া, হাঁ করে রয়েছে, যেন প্রকাণ্ড এক দৈত্য। চোখা চোখা পাথর ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে, যেন হাঁয়ের মাঝে দৈত্যের দাঁত। ওসব দাঁতের যে কোন একটাতে শুধু ছোঁয়া লাগলেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে খুদে বিমানটা। সাংঘাতিক বিপজ্জনক পথ।

সীট থেকে উঠে জোনসের কাঁধের ওপর দিয়ে অলটিমিটারের দিকে তাকাল কিশোর। সতেরো হাজারের ঘর ছুঁই ছুঁই করছে কাঁটা। তার মানে পর্বত ডিঙিয়ে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, ওপর দিকে ফাঁকটা যেখানে বেশি সেখান দিয়েও যেতে পারবে না।

কিন্তু সতেরো হাজারও টিকল না। হঠাৎ করে সরতে শুরু করল অলটিমিটারের কাঁটা।

'আরি! এই, কি করছিস?' বোনানজাকে ধমক দিল জোনস। 'ওঠ ওঠ, এত নামলে চলবে কেন?' ওপরে তোলার চেষ্টা করতে লাগল সে।

বোনানজার তো ওঠার খুবই ইচ্ছে, কিন্তু ভর রাখতে পারছে না, উঠবে কি করে? বাতাসের ভয়াবহ নিম্নগামী স্রোত প্লেনটাকে দ্রুত নিচে টেনে নামাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করল জোনস, ওঠাতে পারল না। নামছে তো নামছেই।

ভয় পেল যাত্রীরা। এইবার বোধহয় রেকর্ড আর টিকল না জোনসের। পাথুরে পাহাড়ে আছড়ে পড়ে ছাতু হয়ে যাবে প্লেন।

কিন্তু টানাহেঁচড়ায় এবারেও জোনসেরই জয় হলো। গিরিপথের পাথুরে মেঝের ছয়শো ফুট ওপরে এসে থামল বিমানের নিম্ন-গতি। ঢুকে পড়েছে দানবের হাঁয়ের মধ্যে।

সোজা যদি চলে যেত পথটা, এক কথা ছিল। বেজায় সরু, তার ওপর রয়েছে নানা রকম বাঁক, মোচড়। কোনটা ইংরেজি S অক্ষরের মত, কোনটা বা U; হাত-পা ছেড়ে দিল যাত্রীরা। ম্যাপের দিকে চোখ নেই কিশোরের, গাইডবুক বন্ধ করে

ফেলেছে রবিন। মুসার চোখ বন্ধ। তাকাতেই সাহস পাচ্ছে না।

পাগলা পাইক নির্বিকার। স্বচ্ছন্দে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বিমানকে। প্রতিটি বাঁক, মোড়, মোচড় তার চেনা। সেটা বড় কথা নয়। সরু পথে যেভাবে বিমানটাকে সামালাচ্ছে, সেটাই দেখার মত। এই মুহূর্তে আরেকটা নিম্নগামী স্রোতে যদি পড়ে বিমান, কি হবে বোধহয় ভাবছেই না সে। কিন্তু ভেবে ভেবে এই ভীষণ ঠাণ্ডার মাঝেও দরদর করে ঘামছে যাত্রীরা।

দুর্ধর্ষ পাইলটের কাছে আরেকবার হার মানল বিরূপ প্রকৃতি। নামতে শুরু করেছে পাথুরে দেয়াল, ফাঁক হচ্ছে ফাটল। হুঁশ করে খোলা আকাশে বেরিয়ে এল বিমান। পেছনে চটিসুটি মেরে পড়ে থাকল যেন পরাজিত, মার খাওয়া পাহাড় আর গিরিপথ।

নতুন এক পৃথিবীতে বেরিয়ে এসেছে বোনানজা। পেছনে হারিয়ে গেছে প্রশান্ত-উপকূলের রুক্ষ, ধূসর অঞ্চল, বৃষ্টি যেখানে প্রায় হয়ই না। নিচে, আশেপাশে আর সামনে এখন ছড়িয়ে আছে উজ্জ্বল সবুজ বনভূমি, যেখানে পানির কোন অভাব নেই। রোদ চকচকে সবুজের মাঝে জালের মত বিছিয়ে রয়েছে যেন রূপালি নদী-নালাগুলো।

'দেখো দেখো!' উচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে উঠল মুসা, খানিক আগে ভয়ে চোখ বন্ধ করে রেখেছিল যে ভুলেই গেছে। 'মেঘ! কি টকটকে লাল!'

নিচে, সবুজের ঠিক ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে ছোট্ট এক টুকরো…হ্যাঁ, মেঘই বলা যায়।

'প্রজাপতি,' হেসে বলল জোনস। 'বেশি না, এই কয়েক হাজার কোটি হবে। একসঙ্গে রয়েছে তো, মেঘের মত লাগছে। ওই যে দেখো, আরেকটা সবুজ মেঘ।'

'টিয়ে না?' বলল রবিন।

'হ্যাঁ।'

'ইয়াপুরা নদীর ওদিকে কিন্তু এতসব দেখিনি।'

'ওটা তো মরু জঙ্গল। এদিকে সেরকম না। এখানে শুধু রঙ আর রঙ। উজ্জ্বল সবুজ, হলুদ, লাল। মিশ্র রঙ যে কত আছে! কাকাতুয়া আর টিউকান পাখির রাজ্যে তো যাওইনি এখনও। বিশ্বাস করতে পারবে না। মনে হবে বুঝি ছবি দেখছ, কাঁচা রঙ গুলে লাগিয়ে দিয়েছে কেউ।'

'ওই যে নিচে একটা নদী,' মুসা বলল। 'ওটাই আমাজন?'

'আমাজনের দাদীর মা বলতে পারো। ওটার নাম প্যাটেটি, কিছু দূরে গিয়ে জন্ম দিয়েছে আমাজনের দাদী প্যাসটাজাকে। প্যাসটাজার মেয়ে ম্যারানন, এবং ম্যারাননের ছেলে হলো গিয়ে আমাজন।'

'খুব সুন্দর বলেছেন,' আন্তরিক প্রশংসা করল কিশোর।

প্রশংসায় লজ্জা পেল জোনস, লজ্জিত হাসি হাসল। অবাক হলো কিশোর—পাগলা পাইকও লজ্জা পায় তাহলে!

'আশ্চর্য কি জানো?' মিস্টার আমান বললেন, 'প্যাটেটের উল্টো দিকে মাত্র একশো মাইল দূরে প্রশান্ত-মহাসাগর। অথচ সেদিকে ফিরেও তাকাল না নদীটা। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তিন হাজার মাইল পাহাড়-জঙ্গল পাড়ি দিয়ে, ঘুরে-ফিরে গিয়ে পড়েছে আটলান্টিকে।'

'আমরাও তাকেই অনুসরণ করতে যাচ্ছি,' হাসল কিশোর, তাতে ভয়ের ছোঁয়া। 'কত বিপদ আর রহস্য অপেক্ষা করছে কে জানে!'

নদীর ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে প্লেন।

অবশেষে শ্যাম্বো নদীর সঙ্গে মিলিত হলো প্যাটেট, জন্ম দিল প্যাসটাজার।

'ওই যে প্যাসটাজা,' হাত তুলল জোনস। বিড়বিড় করল, 'রহস্যময় নদী। জিভারোদের নদী।'

টপো নামের ছোট্ট একটা সীমান্ত ঘাঁটি পেরোল ওরা, তার পর মেরা ছাড়াল। সভ্যতার সামান্যতম ছোঁয়া যা ছিল, তা-ও এখন শেষ। পুরোপুরি অসভ্য এলাকার ওপর এসে পড়েছে ওরা।

সামনে ইনডিয়ানদের একটা গ্রাম, নাম পুইয়ো।

গাইডবুক দেখে বলল রবিন, 'পুইয়োর পর থেকে শুরু হয়েছে ঘন জঙ্গল। পথ এত বেশি দুর্গম, হেঁটে যাওয়াও সম্ভব না। উপায় একটাই, নৌকা।'

'হ্যাঁ,' হাঁটুতে রাখা ম্যাপে টোকা দিল কিশোর। 'বিন্দু বিন্দু বসিয়ে চিহ্ন দিয়েছে। অর্থাৎ, এখানটায় সার্ভে হয়নি এখনও।'

ছোট একটা পাহাড়ী নদী দেখা গেল। সেটা পেরোনোর জন্যে তৈরি হয়েছে দড়ির ঝোলানো সেতু। সেতুর পরে খানিকটা খোলা জায়গা।

গন্তব্য এসে গেছে। নামার জন্যে তৈরি হলো জোনস।

'স্টলিং স্পীড কত?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'পঁচানব্বই কিলোমিটার,' জবাব দিল জোনস।

আরিব্বাবা। চমকে গেল কিশোর। নিচে মাঠটা খুবই ছোট। মিনিটে দেড় কিলোমিটারেরও বেশি গতিবেগ। এই অবস্থায় ল্যাণ্ড করবে কি করে প্লেন? তার ওপর ঠিকমত ব্রেক কাজ করে না। আরেকটা কেরামতি দেখাতে হবে জোনসকে।

মাঠের শেষে কতগুলো কুঁড়ে। এধরনের কুঁড়ে তিন গোয়েন্দার পরিচিত। জিভারো ইনডিয়ানদের বাড়িঘর, ইয়াপুরায় দেখেছে। আস্ত গাছের বেড়া। শুধু ঘাসের বেড়াও আছে কিছু কিছু ঘরের।

বিমানের নাক নামাল জোনস, চিলের মত ছোঁ মারল যেন। মাটিতে হোঁচট খেল চাকা, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ছুটতে শুরু করল। একটা বড় কুঁড়ের ঘাসের বেড়া ভেঙে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। গতি এমনিতেই কমে এসেছিল, বাধা পেয়ে ধাক্কা দিয়ে থেমে গেল। ঘরে কয়েকজন ইনডিয়ান শুয়ে-বসে আরাম করছিল নিশ্চিন্তে। তাতে ব্যাঘাত ঘটাল বেরসিক বোনানজা। লাফিয়ে উঠে যে যেদিকে পারল দৌড় দিল ওরা। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে।

বিচিত্র কায়দায় নরমুণ্ড শিকারীদের স্বাগতম জানাল যেন পাগলা পাইক। ভাগ্যিস ইনডিয়ানদের কেউ আহত হয়নি। তাহলে কুঁড়ের তাকে সাজিয়ে রাখা খুদে মুণ্ডগুলোর সঙ্গে নির্ঘাত যোগ হত আরও পাঁচটা মাথা।

চার

মনে হলো ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়েছে। ছুরি-বল্লম নিয়ে ছুটে এল ইনডিয়ানরা। যোদ্ধাদের বিকট চিৎকার তো আছেই, সেই সঙ্গে চেঁচিয়ে গ্রাম মাথায় করেছে মেয়েমানুষ আর বাচ্চারা।

ককপিটের দরজা দিয়ে মাথা বের করে দিল জোনস। মুখে হাসি। জিভারোদের কায়দায় স্বাগত জানাল বুড়ো সর্দারকে। চেঁচামেচি কমল না তাতে, কিন্তু নিমেষে রাগ মুছে গিয়ে জন্ম নিল উল্লাস। পাগলা পাইক তাদের অতিপরিচিত। সিংকোনা আর কুইনিন সংগ্রহকারীদের নিয়ে আগেও অনেকবার এসেছে।

যাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দিল জোনস।

স্বাগত জানাল ইনডিয়ানরা। মেহমানদের নিয়ে চলল সর্দারের কুঁড়েতে। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গ্রাম, ঝকঝকে তকতকে, হামুর গ্রামটা এত পরিষ্কার ছিল না। ইনডিয়ানদের একই উপজাতি, কিন্তু গ্রামে গ্রামে কত তফাৎ।

গ্রাম দেখে মানুষগুলোকে মনেই হয় না এরা ভয়াবহ নরমুণ্ড শিকারী। গ্রামের বাইরে ভুট্টা আর সীমের খেত, কলা বাগান। কিছু কিছু কুঁড়েতে রয়েছে তাঁত, কাপড় তৈরি হয়। খরস্রোতা প্যাসটাজার ঘাটে বাঁধা রয়েছে সারি সারি নৌকা, আস্ত গাছ কুঁদে তৈরি।

'বুদ্ধিমান লোক ওরা,' বলল জোনস, 'আর খুব সাহসী। ইনকারা কোন দিন হারাতে পারেনি ওদের। স্প্যানিয়ার্ডরা জোর করে কিছুদিন শাসন করেছিল বটে, কিন্তু পরে সব ইনডিয়ানরা এক হয়ে শুয়োর খেদান খেদিয়েছে তাদের। ইকোয়াডর সরকারও ওদের ঘাঁটায় না, যার যার মত থাকতে দেয়।'

'শার্ট-প্যান্ট পায় কোথায়? সভ্য জগতের পোশাক?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'তাঁত আছে, বানিয়ে নেয়। এমনিতে কাপড়-চোপড় পরেই থাকে ওরা, কিন্তু লড়াই বাধলে অন্যরকম। উলঙ্গ হয়ে গায়ে রঙ মেখে সঙ সাজে, একেকটা যোদ্ধা তখন একেকটা ভূত। বিকট করে ফেলে চেহারা।'

শার্ট-প্যান্ট পরা অবস্থায়ও কিছু লোককে বুনো দেখাচ্ছে। কালো ঝাঁকড়া চুল এলোমেলোভাবে নেমেছে ঘাড়ের কাছে। মাথায় টিউকান পাখির পালকে তৈরি মুকুট।

'প্রতি দু-জন জিভারোর একজন সভ্য, আরেকজন বুনো,' বলল জোনস। 'সে এক মজার ব্যাপার। কোন্‌জনের পাল্লায় পড়লে কি ঘটবে নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছ।'

সর্দারের ঝুঁড়ের বেড়ায় ঝুলছে রাশি রাশি ব্লো-গান,বল্লম, ধনুক আর তীর। আছে রাজকীয় *টিগ্রে* আর কুটিল চিতাবাঘের চামড়া।

খাবারের সময় হয়েছে। খাবার এল।

'আরিব্বাবা, এত বড় ডিম!' বলল রবিন। 'মুরগীগুলো কত বড়?'

হাসল জোনস। 'মুরগীগুলো? একেকটা কম পক্ষে দশ ফুট লম্বা। যা দাঁত আর চোয়ালের যা জোর, আমাদেরই চিবিয়ে কিমা বানিয়ে দিতে পারে।'

'অ্যালিগেটরের ডিম, রবিন,' হেসে বলল কিশোর। 'কেমন লাগছে?'

মুখ বিকৃত করে ফেলল রবিন। 'এতক্ষণ তো ভালই লাগছিল। জেনেও খেতে খারাপ লাগছে না তোমার?'

'এখানে খাওয়ার বাছবিচার করলে মারা পড়ব। মনকে মানিয়ে নিয়েছি। স্বাদ যখন ভাল, অসুবিধে কি?'

'কাবাবটা কিসের মাংসের?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'নিশ্চয় জংলী ছাগল?'

'জংলীই, তবে ছাগল নয়, ইগুয়ানা,' জবাব দিল জোনস। 'পাঁচ-ছয় ফুট লম্বা এক জাতের গুঁইসাপ, এদিকের জঙ্গলে অভাব নেই। চিড়িয়াখানার জন্যে নিতে পারো। খাচ্ছ যে, কিসের মাংস বলো তো ওটা?'

'বনগরু,' রবিন বলল। এত অখাদ্যের মধ্যে এটা মোটামুটি ভাল খাদ্য মনে হচ্ছে তার, অন্তত রুচিসম্মত। আরেক টুকরো কেটে নিয়ে কামড় বসাল।

'উঁহু। সিংহ, পার্বত্য সিংহ।'

'মানে···পুমার মাংস! ওয়াক, থুহ!' চিবানো মাংস থু-থু করে ফেলে দিল রবিন।

'ও কিছু না। দু-দিনেই অভ্যাস হয়ে যাবে,' বললেন মিস্টার আমান। 'কিশোর বলল না, মনটাকে তৈরি করে নিলেই হলো।'

কিন্তু পারল না রবিন। আমিষ খাওয়া বাদ দিয়ে নিরামিষের দিকে ঝুঁকল। ভুট্টার আটার মোটা রুটি আর কলা-পেঁপে। কিন্তু ঘিনঘিনে ভাবটা দূর করতে পারল না। রুচি আরও নষ্ট করল তাকে সাজানো অসংখ্য নরমুণ্ড। একটা মাথা ঝুলছে দরজার ঠিক ওপরে। রবিন যেখানে বসেছে সেখান থেকে খুব বেশি চোখে পড়ে।

রবিনের দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকালেন মিস্টার আমান। বললেন, 'ওটাকে বেশি সম্মান দেয়া হয়েছে।'

ইংরেজি বোঝে না সর্দার। কিন্তু মুণ্ডটার দিকে মেহমানদের ঘনঘন তাকাতে দেখে অনুমান করে নিল, ওটার আলোচনাই হচ্ছে। জোনসকে কিছু বলল।

জিভারোদের সবারই ভাষা মোটামুটি এক হলেও অঞ্চলে অঞ্চলে কিছু রদবদল রয়েছে। ইয়াপুবার যে ভাষাটা তিন গোয়েন্দা জানে, তার সঙ্গে পুইয়োর ভাষার পার্থক্য আছে, তাই পুরোপুরি বুঝতে পারল না।

'সর্দারের দাদার মুণ্ড ওটা,' দোভাষীর কাজ চালাল জোনস। একটু থেমে বলল, 'কারও কারও মতে মুণ্ড সংরক্ষণ বর্বরতা। আসলে কি তাই? এরা তো শুধু

মাথাটা মমি করে রাখছে, মিশরী রাজারা যে পুরো দেহটাই মমি করে রাখত? মরে যাওয়ার পর লাশটা নিয়ে কি করা হলো না হলো, সেটা কোন ব্যাপারই নয়। এই ইণ্ডিয়ানদের রীতিটা বরং ভালই মনে হয় আমার কাছে। মৃত্যুর পরও প্রিয়জনের স্মৃতি এভাবে ধরে রাখতে পারাটা···দাদা নাকি খুব ভালবাসত সর্দারকে, সর্দারও ভালবাসত দাদাকে। তাই এভাবে সবচেয়ে বড় সম্মান দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে দরজার ওপর।'

'আত্মীয়-স্বজনের মুণ্ড যত খুশি রাখুক, কে বলতে যাচ্ছে,' মুসা বলল, 'কিন্তু শত্রুর মাথা যে রাখে? নিশ্চয় সম্মান দেখানোর জন্যে নয়?'

'সেটা অন্য কারণ। ওদের বিশ্বাস, শক্তিশালী একজন যোদ্ধার মাথা কাছে রাখতে পারলে মৃতের শক্তিটা তার মধ্যে চলে আসবে। দুর্বল লোক, মেয়েমানুষ কিংবা বাচ্চার মাথা তো রাখে না। মুণ্ড সংরক্ষণের পদ্ধতিটাও খুব জটিল, তাই আজেবাজে মাথার পেছনে সময় নষ্ট করতে চায় না।'

'যদি না সেটা থেকে কিছু আয় হয়,' যোগ করলেন মিস্টার আমান, 'তাই না?'

'হ্যাঁ। তবে নিজের কুঁড়েতে বাছা বাছা মাথা ছাড়া রাখবে না কিছুতেই।'

'আমাদেরকে আবার সম্মানিত করার চেষ্টা করবে না তো?' তাকের মুণ্ডগুলোর দিকে বাঁকা চোখে তাকাল মুসা।

'বিশ্বাস কি?' হাসল জোনস। 'একটা কথা কিন্তু বলিনি। বিদেশীদের মাথার বিশেষ কদর করে ওরা। ওদের ধারণা, ওসব মাথায় জাদুশক্তি খুব বেশি। তাই অলৌকিক ক্ষমতার লোভে ওগুলো জোগাড় করে।'

'খাইছে!' নিজের মাথা চেপে ধরে সর্দারের দিকে ফিরল মুসা। 'না বাপু, সর্দারের পো, আমার এটাতে কিচ্ছু নেই বাবা। আমি নেহায়েত মুখখু-সুখখু মানুষ। প্রায়ই বোকা, হাঁদা, গর্দভ বলে গাল দেয় কিশোর। টিচাররা তো বলদ ছাড়া কিছুই বলে না। তবে হ্যাঁ, বুদ্ধি যদি বাড়াতেই চাও, ওরটা রাখতে পারো। আর বইয়ের বিদ্যে চাইলে রবিনেরটা।'

হেসে উঠল জোনস। কিশোর আর রবিন হাসল। মিস্টার আমানও হাসছেন। কিছুই না বুঝে সর্দারও জোরে জোরে হাসতে লাগল।

হাসার পর, হাসার কারণ জানতে চাইল সর্দার।

বলল জোনস।

আঁতকে উঠল সর্দার। গম্ভীর হয়ে গেছে। জোরে জোরে মাথা নেড়ে কিছু বলল।

'ও বলছে,' অনুবাদ করল জোনস, 'মেহমানদের মাথা কিছুতেই কাটে না জিভারোরা। তাতে নাকি ভীষণ পাপ হয়।'

'যাক বাবা, বাঁচলাম,' এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলো মুসা। 'এত ভাল ভাল খাবার, গিলতেই পারছিলাম না।'

শেষ হলো খাওয়া।

উঠে গিয়ে তাকে সাজানো ট্রফিগুলো দেখতে লাগলেন মিস্টার আমান। ওরকম একটা মুণ্ডের জন্যে হাজার ডলার দিতে রাজি আছে লস অ্যাঞ্জেলেসের মিউজিয়াম অভ নেচারাল হিস্ট্রি।

কিশোর এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। 'আংকেল, একটা কিনে নিলে কেমন হয়?'

প্রথমে রাজি হলো না সর্দার।

কিন্তু নাছোড়বান্দা জোনসের কবলে পড়েছে। নানা রকম ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করল সে। বোঝাল, বিশাল কুঁড়েতে নিয়ে দরজার কাছে রাখা হবে মাথাটা। এত বড় কুঁড়ে ইনডিয়ানদের কোন গ্রামে নেই। হাজার হাজার মানুষ দেখতে আসবে রোজ। দেখে জিভারোদের প্রশংসা করবে। এত বড় সম্মান কি ছেড়ে দেয়া উচিত?

গলে গেল সর্দার, প্রথমেই চোখ তুলে তাকাল তার দাদার দিকে। কিন্তু না, দাদাকে কাছছাড়া করতে পারবে না সে, বড় বেশি ভালবাসে। তাক থেকে আরেকটা সুন্দর ট্রফি নিয়ে এল। 'আমাদের সব চেয়ে বড় যোদ্ধাদের একজন। খুব জ্ঞানী আর ভাল লোক। ও যাবে তোমাদের দেশে।'

'নাম কি?'

'কিকামু।'

'দাম কত?'

দ্বিধায় পড়ে গেল সর্দার। উপহারের দাম নেয়াটা ভাল দেখায় না। মাথা নাড়ল সে।

জোনসও ছাড়বে না।

শেষে জোর করে কিছু টাকা সর্দারের হাতে গুঁজে দিলেন মিস্টার আমান। বললেন, এটা মেহমানদের তরফ থেকে উপহার।

এরপর সর্দার জানতে চাইল, মেহমানরা কেন এসেছে।

শুনে মুখের ভাব বদলে গেল সর্দারের। অনেক কথা বলল।

'সর্দার বলছে,' জোনস জানাল, 'ওদিকে যাওয়া ঠিক হবে না আপনাদের। মারা পড়বেন। ভাটির ইনডিয়ানরা নাকি মোটেও সুবিধের নয়। সাংঘাতিক বুনো, মাথা কাটার বাছবিচার নেই, বিদেশীদের একদম দেখতে পারে না।'

কিন্তু ফিরে যেতে রাজি নন মিস্টার আমান। 'ওদের কাছে বন্দুক নেই।'

'নেই। কিন্তু ব্লো-গান আছে, বিষাক্ত চোখা কাঠি ছোঁড়ে। তাছাড়া বল্লম আছে, বিষমাখা তীর আছে, নিশানা মিস করে না।'

'জানি। ওদের সঙ্গে ভাব করে নেব।'

'ভাব করার আগেই যদি বিষ ঢোকায় আপনাদের রক্তে?'

'ঝুঁকি নিতেই হবে। আমেরিকান জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিকে কথা দিয়ে এসেছি, প্যাসটাজার ভাটি অঞ্চলের একটা খসড়া ম্যাপ করে নিয়ে যাব। চুক্তি মোতাবেক বেশ কিছু টাকাও দিয়েছে খরচের জন্যে। চিড়িয়াখানা আর সার্কাস

পার্টির কাছ থেকেও আগাম টাকা নিয়ে এসেছি, দুর্লভ জানোয়ার জোগাড় করে দেব বলে। এখন তো আর পিছিয়ে যেতে পারি না। সর্দারকে জিজ্ঞেস করুন, একটা নৌকা বিক্রি করবে কিনা।'

তাতে আপত্তি নেই সর্দারের। কিন্তু বিষণ্ণ মুখে বার বার বলল, মেহমানদের কিছুতেই যাওয়া উচিত হচ্ছে না ওদিকে। 'বোকা বিদেশীগুলোকে' কিছুতেই নিরস্ত করতে না পেরে, শেষে রাতটা অন্তত তার সঙ্গে কাটিয়ে যাওয়ার দাওয়াত করল সর্দার।

এতে রাজি হলো অভিযাত্রীরা। সর্দারকে অখুশি করতে চাইল না।

'আবার কুমিরের ডিম খেতে হবে!' শুঙিয়ে উঠল রবিন।

'তা নাহয় খেলাম। আমার ভয়, জংলী হারামীদের তীর খেয়ে না মরি,' মুসা বলল।

'দেখো,' গম্ভীর হয়ে বললেন মিস্টার আমান, 'ভয় পেলে কিংবা খুঁতখুঁত করলে অ্যাডভেঞ্চার হয় না। আরাম চাইলে বাড়িতে বসে থাকলেই পারতে। এখনও সময় আছে, ইচ্ছে করলে জোনসের সঙ্গে ফিরে যেতে পারো।'

ম্যাজিকের মত কাজ করল তার কথা। ডজন ডজন কুমিরের ডিম খেতেও আপত্তি রইল না রবিনের। জংলীদের তীর কেন, বল্লমের খোঁচায় মোরব্বা হতে রাজি আছে মুসা, তবু 'কাপুরুষ' দুর্নাম নিয়ে রকি বীচে ফিরে যাবে না।

প্রায় সারাদিনই খায় এখানকার জিভারোরা।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আবার এল খাবার। তবে এবার আর কুমিরের ডিম নয়। লালচে-সাদা মাংসের বেশ বড় বড় টুকরো। খুব নরম। আঁশটে গন্ধ, অনেকটা মাছের মত, তবে স্বাদটা মুরগীর। মুখে দিয়ে ভাল লাগল রবিনের, জিজ্ঞেস করল না কিসের মাংস। জানলেই যাবে অরুচি হয়ে।

কিন্তু মুসা জিজ্ঞেস করে বসল।

'বোয়া কনস্ট্রিকটর,' জানাল জোনস। 'এক জাতের মস্ত অজগর।'

'ব্যাটারা সাপও বাদ দেয় না,' বিড়বিড় করল রবিন। চিবানো থামাল না, কিন্তু বিস্বাদ হয়ে গেল খাবার। কোঁত করে গিলে ফেলল। বকা শুনতে আর রাজি নয়।

তার অবস্থাটা বুঝলেন মিস্টার আমান। হেসে বললেন, 'খেলে ক্ষতিটা কি বলো? যদি হজম হয় আর স্বাদ খারাপ না হয়? কেন, সভ্য ফরাসীরা শামুক খায় না, চীনারা পাখির বাসা খায় না, জাপানীরা আগাছা খায় না? আর আমরাও তো সী-সাইডের রেস্টুরেন্টগুলোতে গিয়ে পিচ্ছিল ঝিনুক খেয়ে আসি হরহামেশা। তুমিও তো অনেক খেয়েছ। ধর্মের কারণে আমরা শুয়োর খাই না, তোমরা তো খাও। তোমার আমার মাঝেই তো খাবারের ফারাক। আসল কথা হলো, মানুষ যেখানে যেভাবে থাকে, প্রকৃতি তাকে যে খাবার সাপ্লাই করে, তাই খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়। কারও কাছে সেটা অমৃত, কারও কাছে কিলবিলে শুঁয়োপোকা।'

কিন্তু লেকচারে কি আর কাজ হয়? অভ্যাস বড় বাজে জিনিস। খাওয়াটা আর

ফেলল না বটে রবিন, তবে রুচিও হলো না, জোর করেই গিলতে লাগল।

বিকেলে কুইটোতে ফিরে চলল জোনস।

বিষণ্ন মুখে তাকে বিদায় জানাল অভিযাত্রীরা। দিগন্তে হারিয়ে গেল প্লেন। তাদের মনে হলো, সভ্যতার শেষ ছোঁয়াটুকুও যেন মুছে গেল।

সাঁঝ হতেই আশপাশের বনে শুরু হলো নানারকম গর্জন, চিৎকার, কাশি—দিনের শব্দগুলোর সঙ্গে ওগুলোর মিল নেই।

সারারাত ভাল ঘুম হলো না কিশোরের। খালি এপাশ ওপাশ করল মাদুরের ওপর বিছানো কম্বলে শুয়ে। একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেল, ঠিক জায়গায়ই এসেছে ওরা, ঠিক জায়গাতেই চলেছে দুর্লভ জন্তু ধরার জন্যে। জন্তু-জানোয়ারের স্বর্গ এই অঞ্চল।

শেষ রাতের দিকে সামান্য তন্দ্রামত এসেছিল। স্বপ্ন দেখল, তাদের তাড়া করছে ভীষণ চেহারার নরমুণ্ড শিকারী জংলীরা।

টুটে গেল তন্দ্রা। ঘেমে গেছে সারা শরীর। জংলীদের ভয়াবহ চেহারা ভাসছে এখনও চোখের সামনে। তাদের মাঝেই ধীরে ধীরে উঁকি দিল আরেকটা চেহারা, জংলীদের চেয়ে কম কুৎসিত নয়। সেই লোকটা, কুইটোতে সেরাতে যে পিছু নিয়েছিল।

জোর করে মন থেকে চেহারাটা দূর করার চেষ্টা করল কিশোর। নিজেকে বোঝাল, কুইটো থেকে অনেক দূরে দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে ওরা, এখানে আসতে পারবে না সেই লোক।

কিন্তু বুঝ মানল না মন।

পাঁচ

পর দিন খুব ভোরে উঠল অভিযাত্রীরা।

ভাল একটা নৌকা দিয়েছে সর্দার। ওদেরই তৈরি একটা ক্যানু। ফুট পঁচিশেক লম্বা, পেটের কাছের সবচেয়ে চওড়া জায়গাটার মাপ দুই ফুট। চার-পাঁচ জন মানুষ আর প্রয়োজনীয় মালপত্র বহন করার উপযোগী।

আস্ত গাছ কেটে তৈরি নৌকাটা না দেখলে কারিগরের দক্ষতা আঁচ করা যায় না। কুঁদে কুঁদে ফেলে দেয়া হয়েছে ভেতরের সমস্ত কাঠ, এক ইঞ্চি পরিমাণ রেখে। নৌকাটার যেখানেই হাত দেয়া যাক, এক ইঞ্চি পুরু। কাঁচা লোহায় তৈরি হাতুড়ি-বাটালে কাজ করেছে কারিগর; শুধু হাতের আন্দাজে কি করে মাপ ঠিক রাখল, কোথাও কম বেশি হলো না, কিংবা ছিদ্র হলো না, ভাবলে অবাক হতে হয়। নৌকা তৈরির পর তার ভেতরে-বাইরে দু-দিকেই পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। না, পোড়ানো হয়েছে বললে ভুল হবে, বরং বলা যায় ভালমত আগুনের ছ্যাঁকা দেয়া হয়েছে। আলকাতরা তো আর নেই ইনডিয়ানদের, তাই পানি যাতে না লাগে তার জন্যে

এই ব্যবস্থা।

হাঁসের পিঠে পানি পড়লে যেভাবে গড়িয়ে পড়ে যায়, চিহ্ন থাকে না, নৌকাটার অবস্থাও তা-ই। তবে একটা দোষ আছে, পানিতে দু-পাশে গড়ায় খুব বেশি। ভারসাম্য ঠিক রাখা কঠিন। ইনডিয়ানদের অভ্যাস হয়ে গেছে। স্বচ্ছন্দে চালিয়ে নিয়ে যায় ওরা, সব চেয়ে খরস্রোতা নদীতে উথাল-পাথাল ঢেউয়েও কাত হয় না নৌকা, দিব্যি তরতর করে ছুটে যায়।

'আমরাও অভ্যাস করে নেব,' মুসা বলল। নৌকা বাওয়ার ওস্তাদ সে। 'রকি বীচে যখন ফিরে যাব,' বুকে থাবা মেরে হাত নাড়ল, 'আচার আচরণে খাওয়া-দাওয়ায় আমরা তখন পুরোদস্তুর জিভারো ইনডিয়ান।'

'কথা বাদ দিয়ে কাজ করো,' তাড়া দিলেন তার বাবা। 'জিনিসপত্রগুলো তোলা দরকার।'

ছোট ছোট পোঁটলা করে বাঁধা হলো সমস্ত মাল। খুব সাবধানে সাজিয়ে রাখা হলো নৌকার তলায়। ওজন কোথাও কম বেশি হলে ভারাসাম্য নষ্ট হবে। একটা পোঁটলার ওপর আরেকটা এমন ভাবে রাখা হলো, প্রয়োজনের সময় যাতে ওগুলো টপকে কিংবা ওগুলোর ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়া যায়। যাত্রী-কাম-মাল্লারা বসে দাঁড় বাওয়ার জন্যে মালের ফাঁকে ফাঁকে অনেকখানি করে জায়গা ছাড়া হলো। ওসব ইনডিয়ান ক্যানুতে পাটাতন থাকে না, তাই পাটাতন বসানোর জন্যে আড়াআড়ি তক্তা লাগানোরও দরকার পড়ে না। নিজেদের সুবিধের জন্যে কয়েকটা তক্তা লাগিয়ে নিল অভিযাত্রীরা। সেগুলোর সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল বন্দুক আর ভারি জিনিসপত্র। কোন কারণে নৌকা উল্টে গেলেও জিনিসগুলো পানিতে হারাবে না।

'ঠিকই আছে সব,' বললেন মিস্টার আমান। 'এবার ছাড়া যায়।'

তীরে দাঁড়িয়ে মেহমানদের বিদায় জানাল জিভারোরা।

পথ-প্রদর্শক হিসেবে একজন জিভারো যোদ্ধাকে অভিযাত্রীদের সঙ্গে দিয়েছে সর্দার।

দিনটা ভারি চমৎকার। উজ্জ্বল রোদ। বানরের চেঁচামেচি, টিয়ে আর কাকাতুয়ার ডাকে মুখর হয়ে আছে নদীর দুই তীরের বনভূমি। পশ্চিমে, অনেক দূরে সবুজ বনের মাথা ছাড়িয়ে বিশ হাজার ফুট উঠে গেছে শিমবোরাজো পর্বতের বরফে ছাওয়া চূড়া। দুই পাশে তার দুই মহাসাগর। একপাশে প্রশান্ত, আরেক পাশে আটলান্টিক—যেদিকে এগিয়ে চলেছে অভিযাত্রীরা।

তীক্ষ্ণ বাঁক নিল নদী। জিভারোদের গ্রাম আড়ালে পড়ে গেল। দু-ধারেই ঘন জঙ্গল। নদীটা এখানে শ-খানেক ফুট চওড়া। কারও সঙ্গে যেন দেখা করার কথা, সময় বয়ে যাচ্ছে, তাই তাড়াহুড়ো করে ছুটে চলেছে টলটলে স্বচ্ছ পানি। সেই সাথে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নৌকা। পাঁচটা দাঁড়ের কোন কাজ নেই, নৌকার মুখ সোজা রাখা ছাড়া।

'দেখো দেখো,' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

ওপরে তাকাল মুসা।

'আরে নিচে, নিচে। পানির তলায়।'

গভীরতা কম। পরিষ্কার দেখা যায় তলার বালি। কালো রঙের ছোট ছোট কয়েকটা পাখি খাবার খুঁজছে।

পাখিগুলোকে বেশিক্ষণ দেখার সুযোগ হলো না, দ্রুত সরে যাচ্ছে নৌকা।

'ওয়াটার উজল্,' বলল কিশোর। 'জলগায়ক বলতে পারো।'

'পানির তলায় উড়ছে,' বলল মুসা।

'উড়ছে না, সাঁতরাচ্ছে,' শুধরে দিলেন মিস্টার আমান। 'ওড়ার মত করেই ডানা ঝাপটায়। শামুক আর পোকা খুঁজছে। দমও রাখতে পারে অনেকক্ষণ।'

মস্ত কালো একটা ছায়া উড়ে এল মাথার ওপর, ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলল।

'আরি, কনডর!' বলল মুসা।

উত্তেজিত হয়ে উঠল বাকু। 'খুব খারাপ!' আমেরিকান শিংকোনা ব্যবসায়ীদের কাছে ভাঙা ভাঙা ইংরেজি শিখেছে সে। বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথার ওপর হাত বুলাল, অশুভ শক্তিকে ঠেকাল যেন।

'কুসংস্কার,' রবিন বলল। 'জিভারোদের বিশ্বাস, কনডর মানেই অশুভ সঙ্কেত। মরার গন্ধ পেলে, কিংবা কোন অঘটন ঘটবে বুঝলেই নাকি হাজির হয় ওরা।'

'খাইছে! তাই নাকি?' ভূতের ভয় মুসার বরাবর। পয়েন্ট টু-টু রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল। 'ব্যাটাকে শেষ করে দেয়াই ভাল।'

বাধা দিলেন মিস্টার আমান। 'পয়েন্ট টু-টুর গুলিতে কিচ্ছু হবে না ওর। গুলিই নষ্ট করবে শুধু।'

'খাওয়া যায় না?'

'ইনডিয়ানরাও খায় না, মাংস এত বাজে।'

মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে বিশাল পাখিটা। এক ডানার মাথা থেকে আরেক ডানার মাথা দশ ফুটের কম নয়।

বিড়বিড় করল মুসা, 'আরিব্বাপরে, কত বড়।'

'এটা তো ছোটই,' বলল কিশোর। 'এর চেয়ে অনেক বড় হয়, দুনিয়ার বৃহত্তম উড়ুক্কু পাখি কনডর। যেমন বড়, তেমন ভারি। অথচ অন্য সব পাখির চেয়ে বেশি ওপরে উঠতে পারে। না খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারে একটানা চল্লিশ দিন। খাবার পেলে একবারেই খেয়ে ফেলে আট-দশ কেজি।'

'শুনেছি, আস্ত ছাগল-ভেড়া নাকি তুলে নিয়ে যায়? মানুষের বাচ্চাও?'

'ভুল। নখে খুব ধার, কিন্তু বেশি ভারি জিনিস তোলার মত করে তৈরি নয়। সাংঘাতিক পাজি, আর দুঃসাহসী। বাগে পেলে ঘোড়াকেও আক্রমণ করতে ছাড়ে না।'

'অবশ্য যদি ঘোড়াটা রোগা কিংবা দুর্বল হয়,' যোগ করল রবিন।

'দুর্বল ঘোড়া' এখানে না পেয়েই যেন কিছুটা হতাশ, কিছুটা মনের দুঃখেই

যেমন এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে উড়ে চলে গেল উত্তরে।

কিন্তু বাকুর ভয় কাটল না। বারে বারে তাকাচ্ছে পাখিটা যেদিকে গেছে সেদিকে, মাথা নাড়ছে আর বলছে, 'ভাল না, ভাল না! ফিরে যাব, ফিরে যাব!'

কিন্তু যাব বললেই তো আর যাওয়া যায় না। ঢাল্ বেয়ে তীব্র গতিতে নামছে স্রোতধারা, শুধু সামনেই এগোনো সম্ভব। পিছানো আর যাবে না।

অযথাই ভয় পেয়েছে বাকু। নিরাপদেই কাটল দিনটা। কোন অঘটন ঘটল না। অনেক পথ পেরিয়ে এল ওরা।

বিকেলের দিকে নোঙর ফেলল। রাত কাটাবে।

জায়গাটা ভারি সুন্দর। নদীর এক পারে সাদা বালির চর। তার পর ছোট একটা পুকুর। তাতে মাছ ঘাই মারছে। পুকুরের ওপাশ থেকে শুরু হয়েছে জঙ্গল, হঠাৎ করে যেন গজিয়ে উঠেছে কালচে গাছের দেয়াল। গাঢ় হলুদ আর টকটকে লাল বুনোফুল পড়ন্ত আলোয় জ্বলছে।

মাথার ওপর দিয়ে ধীর গতিতে ভেসে যাচ্ছে সারস বক।

নদীর পারে বড় বড় কয়েকটা গাছ, তার নিচে ক্যাম্প করবে ঠিক করেছে ওরা। তলাটা পরিষ্কার, ঝোপঝাড় নেই।

খালি জায়গার পরে যেখানে বন শুরু হয়েছে, সেখানে ঠাসাঠাসি ঝোপঝাড়ের মধ্যে সরু একটা ফাঁক দেখা গেল।

'পথ মনে হচ্ছে?' বাকুর দিকে ফিরলেন মিস্টার আমান, 'ইনডিয়ান?'

দ্বিধা দেখা দিল বাকুর চোখে। সে নিজে একবার পরীক্ষা করে দেখল। নরম বালিতে পায়ের ছাপ দেখিয়ে মাথা নাড়ল। ইনডিয়ান নয়।

ছেলেদেরকে ডেকে এনে দেখালেন মিস্টার আমান। 'এগুলো পেকারির খুরের দাগ।'

'আমাজনের বুনো শুয়োর তো?' কিশোর বলল, 'দল বেঁধে নাকি চলে। মানুষকে আক্রমণ করতেও দ্বিধা করে না।'

'হ্যাঁ।'

'আমিও পড়েছি,' রবিন বলল। 'একবার নাকি একজনকে তিন দিন তিন রাত গাছের ডালে আটকে রেখেছিল পেকারির দল, নামতে দেয়নি।

'তারমানে এক নম্বর হারামী,' মুসা মন্তব্য করল।

আশপাশে আরও পায়ের ছাপ দেখালেন মিস্টার আমান। 'রাতে এখানে পানি খেতে আসে জানোয়ার। এই দেখো, ক্যারিবারার পায়ের দাগ। দুনিয়ার সব চেয়ে বড় ইঁদুর, ভেড়ার সমান একেকটা। আর এই যে, হরিণের পায়ের ছাপ।'

'হ্যাঁ,' হরিণের খুরের দাগ মুসাও চেনে। বাবার সঙ্গে কলোরাডোতে শিকারে গিয়েছিল, তখন দেখেছে। 'বাবা, এটা কিসের দাগ? এরকম তো জীবনে দেখিনি।'

বড় বড় পিরিচের চাপে যেন তৈরি হয়েছে দাগগুলো।

'টিগ্রে!' ভয়ে ভয়ে বনের দিকে তাকাল বাকু। 'খারাপ জায়গা, খারাপ জায়গা!'

'এই টিগ্রেটা কি জিনিস?' জানতে চাইল মুসা।

'স্প্যানিশ ভাষায় টাইগারকে টিগ্রে বলে,' জবাব দিল কিশোর। 'মেক্সিকো আর সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকায় জাগুয়ারের নাম টিগ্রে। বাঘই এটা। তবে ডোরাকাটা নেই, আছে কালো গোল গোল ছাপ। ব্রাজিলিয়ান সীমান্তের কাছের পর্তুগীজেরা বলে ওনকা। যে নামেই ডাকা হোক, আমাজন বনের ওরা রাজা।'

'ভালো না, ভালো না,' কেঁদে ফেলবে যেন বাকু। 'ফিরে যাব, ফিরে যাব!'

'আরে কি মুশকিল,' বিরক্ত হয়ে বলল মুসা। 'খালি ফিরে যাব ফিরে যাব করে। কে আসতে বলেছিল?'

'ভালো জায়গা পাওয়া গেছে,' দু-জনের কারও কথায়ই কান না দিয়ে বলল কিশোর। 'পানি খেতে এলে আজ রাতেই জাগুয়ারের ছবি তুলব।'

'এসে যদি মানুষের মাংসও খেতে চায়? রবিন বলল।

'না, সে ভয় তেমন নেই,' আশ্বাস দিলেন মিস্টার আমান। 'আমরা কিছু না করলে ওরাও কিছু বলবে না। তাছাড়া আমরা থাকব অনেক ওপরে, হ্যামকে।'

তাঁবু-টাবু আর স্লীপিং ব্যাগের ঝামেলা নেই, দশ মিনিটেই ক্যাম্প তৈরি হয়ে গেল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা জিনিসও জঙ্গলে সঙ্গে নেয় না অভিজ্ঞ শিকারীরা। নিলে শুধু বোঝাই বাড়ে, চলার অসুবিধে হয়, কাজে তেমন লাগে না।

মোট চারটে হ্যামক টানানো হয়েছে।

হ্যামক এক ধরনের বিছানা। আমাজন জঙ্গলের ইনডিয়ানরা তো বটেই, দক্ষিণ আমেরিকার শহর অঞ্চলের অনেক বাড়িতেও হ্যামকই একমাত্র বিছানা। দিনের বেলা গায়েব, দেয়ালে দেয়ালে শুধু দেখা যাবে লোহার হুক গাঁথা। রাতে লিভিং রুম হয়ে যাবে বেডরুম। ওই হুক থেকেই ঝুলবে ঝুলন্ত বিছানাগুলো। জায়গা নষ্ট হয় না, বাড়তি বিছানা বিছিয়ে রাখার ঝামেলা নেই, মেহমান এলে কোথায় শোয়ানো যায়—ভেবে ভেবে যন্ত্রণা পাওয়ার কারণ নেই, সঙ্গে করে নিয়ে আসে যার যার হ্যামক। জিনিসটা অনেকটা ইজিচেয়ারে শোয়ার মত। ওই রকমই এক টুকরো কাপড় ঝুলিয়ে বিছানা হয়ে যায়। বাড়িঘরে যেগুলো ব্যবহার হয়, ওগুলোর চার কোণায় চারটে ফাঁস থাকে, ফাঁসগুলোকে হুকে আটকে দিতে হয়। আর জঙ্গলে ব্যবহারের সময় চার কোণার চারটে দড়ি গাছে বাঁধতে হয়। দুই দড়ির হ্যামকও আছে। সেগুলোতে ইজি চেয়ারের ডাণ্ডার মতই কাপড়ের দুই প্রান্তে ডাণ্ডা ঢোকানো থাকে।

আমাজন জঙ্গলের সব ইনডিয়ানরা অবশ্য হ্যামক ব্যবহার করে না, যেমন জিভারোরা। বাকু তাই অন্য ব্যবস্থা করল। মাটিতে ছোটখাটো একটা কবর খুঁড়ল। রাতে তার মধ্যে ঢুকে শুধু মাথাটা বাইরে রেখে গায়ের ওপর মাটি চাপা দিয়ে দেবে।

দিনের বেলা অসহ্য গরম, রাতে তেমনি হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা। রোদ-তপ্ত মাটি

রাতে গরম কম্বলের কাজ দেয়।

বিছানা তৈরি শেষ। তীর-ধনুক নিয়ে বাকু চলল মাছ মারতে। ছেলেরাও চলল সঙ্গে। তীর দিয়ে কিভাবে মাছ শিকার করে, দেখেনি কখনও।

পুকুরে মাছের অভাব নেই। ঝাঁকে ঝাঁকে ভেসে রয়েছে। দেখতে দেখতে গোটা দুই বেশ ভাল সাইজের মাছ ধরে ফেলল বাকু, পাঁচজনেরই চলবে।

শিকার নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা।

আগুন ধরিয়ে ফেলেছেন মিস্টার আমান। শুকনো ডাল-পাতা ফেলতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

রাঁধতে বসল বাকু। ইনডিয়ান রান্না। নদীর পার থেকে পরিষ্কার কাদা তুলে এনে দুটো মাছের গায়েই পুরু করে মাখাল, বড় বড় দুটো কাদার পিণ্ড হয়ে গেল। কয়লার গনগনে আগুনে ফেলে দিল ওগুলো। তারপর বস্তা থেকে আলু বের করে মাছের মত একই ভাবে কাদা মাখালো। ওগুলোও ফেলল আগুনে।

কাদা শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেল এক সময়। পিণ্ডগুলোকে আগুন থেকে বের করে পিটিয়ে কাদার আস্তরণ ভাঙল বাকু। ছুরি দিয়ে কেটে মাছ আর আলু ছেড়ে দিল সবার পাতে।

ভোজনরসিক মুসা আমানকেও স্বীকার করতেই হলো, চমৎকার রান্না, ভাল স্বাদ।

রাত নেমেছে। আর বসে থেকে লাভ নেই। হ্যামকে উঠল অভিযাত্রীরা। বাকু গেল তার কবরে।

হ্যামকের ওপরে ঝোলানোর জন্যে মশারি আছে, কিন্তু সেগুলো খোলার দরকার হলো না। মশা নেই এখানে। তবে বিষাক্ত কীট, এই যেমন পিপড়ে, শতপদী, বিচ্ছু, এসব আছে এন্তার। গাছ থেকে দড়ি বেয়ে বিছানায় উঠে আসতে পারে। তাই দড়িতে তীব্রগন্ধী কীটনাশক মাখিয়ে দেয়া হয়েছে।

তিন গোয়েন্দার কেউই আগে কখনও হ্যামকে শোয়নি। খাট তো নয় যে ধড়াস করে তাতে শুয়ে পড়লেই হলো। দুটো দড়ির ওপর ভার, ভারসাম্য ঠিক রাখার ব্যাপার আছে। একটু এদিক-ওদিক হলেই বিছানা যাবে উল্টে, ধুপুত করে গড়িয়ে তখন একেবারে মাটিতে।

'সোজা শুয়ো না,' হুঁশিয়ার করলেন মিস্টার আমান। 'কোণাকুণি শোও। নাহলে থাকতে পারবে না।'

দ্রুত অভ্যাস করে নিল ছেলেরা। কম্বল টেনে দিল গায়ের ওপর।

মিস্টার আমান আর মুসার নাক ডাকানোর শব্দ শোনা গেল। রবিনও ঘুমিয়ে পড়ল। কিশোর জেগে রইল ক্যামেরা নিয়ে। বেশি নড়াচড়ার উপায় নেই। সাবধানে কাত হয়ে বাকুর দিকে তাকাল সে।

খুব ভালমত জায়গা বেছে গর্ত করেছে বাকু। জন্তু-জানোয়ারের চলার পথ থেকে দূরে উঁচু জায়গায়। আগুনের আলোয় তার মুখটা আবছা দেখা যাচ্ছে।

ঘুমিয়েছে কিনা বোঝার উপায় নেই।

দিবাচরেরা ঘুমিয়েছে, জেগে উঠল নিশাচরেরা। শুরু হলো হাঁক-ডাক। যেন বলছে, 'এই ওঠো ওঠো, বেলা হয়েছে। আর কত ঘুমাবে।'

ঝিঁঝির কানে-জ্বালা-ধরানো ডাক দিয়ে শুরু হলো। কিছুক্ষণ ডেকে ক্লান্ত হয়ে সুর পাল্টাল ওরা। খাদে নামল শব্দ, দ্রুত লয় থেকে সরে এসেছে টানা লয়ে।

ড্রেইম ড্রেইম করে ডেকে উঠল একটা ব্যাঙ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে শুরু হয়ে গেল ডাক। সেই সঙ্গে যোগ হলো অন্য প্রজাতির হোউ-হেহা এবং ক্রোঁক ক্রোঁক। আরও ব্যাঙ আছে, তাদের কেউ গোঙাল, কেউ বা ঘ্যানর ঘ্যানর করতে লাগল। সে এক বিচিত্র কলতান।

হঠাৎ বেরসিকের মত বেসুরো গলায় চিৎকার করে উঠল একটা নাইটজার। ভূত বিশ্বাস করে না কিশোর। তার মনে হলো, যদি ভূত থাকত তাহলে হয়তো ওভাবেই কাঁদত। গায়ে কাঁটা দিল তার।

আরও নানারকম শব্দ হচ্ছে। বেশির ভাগই অচেনা।

হঠাৎ ভীষণ গলায় কেশে উঠল কে যেন! নিমেষে চুপ হয়ে গেল অন্য সমস্ত শব্দ। ওই কাশি কিশোরের চেনা।

শিকারে বেরিয়েছেন মহাবনের মহারাজা, মহাবীর টিগ্রে!

ছয়

দুপ করে একটা শব্দ। মুহূর্ত পরেই কানের পর্দা ফুঁড়ে দিল যেন তীক্ষ্ণ চিৎকার।

এত চমকে গেল কিশোর, আরেকটু হলেই পড়ে গিয়েছিল। টর্চের আলো ফেলল মাটিতে।

মিস্টার আমান জেগে গেছেন, রবিনও। আরও দুটো টর্চ জ্বলে উঠল।

আবার বুনো চিৎকার। মুসার গলা মনে হচ্ছে? জাগুয়ারে ধরল না-তো! কিন্তু কই, কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না।

'বাঁচাও! বাঁচাও!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

তিনটে আলো একসঙ্গে ঘুরে গেল সেদিকে।

পাগল হয়ে গেছে যেন মুসা। জংলী-নৃত্য জুড়েছে। শরীরের যেখানে-সেখানে খামচি মারছে, থাপ্পড় মারছে। টেনে-ছিঁড়ে খুলে ফেলল শার্ট-প্যান্ট, গেঞ্জি আর জাঙ্গিয়াও গায়ে রাখতে পারল না। একেবারে দিগম্বর। সেই অবস্থাতেই নাচানাচি। ঘাম-চকচকে কালো শরীর। সে-এক দেখার মত দৃশ্য।

'হেই, কিছু করো!' কেঁদে ফেলবে যেন মুসা। 'কিছু করো!'

লাফিয়ে হ্যামক থেকে নামলেন মিস্টার আমান। আলো ফেললেন মুসার কাছাকাছি মাটিতে। 'করো, জলদি সরো ওখান থেকে! খেয়ে ফেলবে তো!'

কালো একটা সারি এগিয়ে চলেছে পিলপিল করে, ফুটখানেক চওড়া। শুরু

নেই, শেষও নেই।

'কী?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

সৈনিক পিঁপড়ে। জবাব দিল কিশোর। 'দেখো দেখো, অফিসারগুলোকে দেখো।'

ওদের সম্পর্কে পড়েছে রবিন। মাঝে মাঝে মাইলখানেকেরও বেশি লম্বা হয় একেকটা দল। চলার পথে জীবন্ত কিছু রাখে না, খেয়ে সাফ করে ফেলে। ভাল করে তাকাল দলটার দিকে। সারির পাশে ছুটাছুটি করছে কিছু পিঁপড়ে। সামনে দৌড় দিচ্ছে, পেছনে যাচ্ছে, মনে হয় দলছুট। আসলে তা নয়, খবরদারি করছে সৈনিকদের।

অগ্নিকুণ্ড থেকে জ্বলন্ত একটা চ্যালাকাঠ তুলে নিলেন মিস্টার আমান। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন মুসাকে।

বললেই কি আর চুপ থাকা যায়? তবু সাধ্যমত স্থির রইল মুসা।

পিঁপড়ের গায়ে জ্বলন্ত কয়লা ঠেসে ধরলেন মিস্টার আমান।

শক্ত, ধারাল বিশাল চোয়াল মাংসে গভীর ভাবে ঢুকিয়ে কামড়ে ধরে আছে পিঁপড়ে, গরম ছ্যাঁকা লাগতেই চোয়াল খুলে খসে পড়ছে। দু-চারটা ছ্যাঁকা মুসার চামড়ায়ও লাগছে। কিন্তু কামড়ের জ্বলুনির চেয়ে ছ্যাকার জ্বালা অনেক কম।

টেনে, খামচে অনেকগুলো শরীর ছিঁড়ে ফেলেছে মুসা। চোয়ালগুলো গেঁথে রইল গায়ে। ওগুলো খোলাই মুশকিল হলো। ছুরির মাথা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অতিসাবধানে একটা একটা করে চোয়াল তুললেন মিস্টার আমান। তারপর ওষুধ লাগিয়ে দিলেন আহত জায়গাগুলোতে। ছোপ ছোপ দাগ পড়েছে, বিচিত্র আলপনা কাটা হয়েছে যেন মুসার শরীরে।

মুখ টিপে হাসল কিশোর ও রবিন, অবশ্যই আরেক দিকে চেয়ে।

'যাও কাপড় পরে ফেলো,' বললেন মিস্টার আমান। 'হ্যামক থেকে নামলে কেন?'

'নামিনি তো,' লজ্জা পাচ্ছে এখন মুসা। 'পড়ে গিয়েছিলাম। ইবলিসগুলোও যাওয়ার আর জায়গা পেল না, একেবারে আমার নিচে দিয়েই···আচ্ছা,বাকুকে ধরল না কেন?'

তাই তো? উত্তেজনায় তার কথা ভুলেই গিয়েছিল সবাই। আলো ফেলা হলো। কবরটা আছে, কিন্তু বাকুর মাথাটা নেই।

'খেয়ে ফেলল নাকি!' আঁতকে উঠল মুসা।

না, খায়নি। কবরের ওপর দিয়েই যাচ্ছে পিঁপড়ে। আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে কিলবিল করছে কিছু। বাকুর মাথাটা যেখানে ছিল, সেখানে সামান্য ফুলে আছে মাটি। তারমানে মুখটাও নিয়ে গেছে মাটির তলায়।

আহত জায়গা ডলল মুসা। 'ইস্, কামড়ও মারে! যা জ্বালা!'

'জানো, ওই পিঁপড়ে দিয়ে শরীরের কাটা সেলাই করে ইনডিয়ানরা,' বললেন

মিস্টার আমান। 'কাটার দুটো ধার টিপে এক করে ধরে সেখানে কামড়াতে দেয় পিপড়েকে। চোয়াল মাংসে গভীর হয়ে গেঁথে গেলে টেনে শরীরটা ছিঁড়ে ফেলে। আটকে থাকে চোয়াল। কাটা জায়গা শুকিয়ে জোড়া না লাগার আগে আর খোলে না।'

'জানি,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'মুসা তো ছোট দলের সামনে পড়েছে। বড় দলগুলো যখন যায়, সাফ করে ফেলে সব। সামনে গ্রাম পড়লেও পথ পরিবর্তন করে না।'

'হ্যাঁ, গ্রামের ওপরই চড়াও হয়,' বললেন তিনি। 'পিপড়ের বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই, গ্রাম ছেড়ে পালায় ইনডিয়ানরা। জঙ্গলে নিরাপদ জায়গায় সরে যায়। তবে পিপড়ের সামনে যাদের গ্রাম পড়ে তারা ভাগ্যবান। ফিরে এসে দেখে সব পরিষ্কার। পোকামাকড় সাপ-ব্যাঙের গোষ্ঠী সাফ।'

শেষ হলো দল। কবরের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল লেজটা। কিভাবে জানি জেনে গেল বাকু। মাটি সরিয়ে আস্তে করে উঁকি দিল ওপরে।

হ্যামকে উঠল আবার সবাই। খুব সাবধানে রইল এবার মুসা।

হই-হট্টগোলে জন্তু-জানোয়ারের আনাগোনা থেমে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে, আস্তে আস্তে শুরু হলো আবার।

চুপ করে পড়ে আছে কিশোর। আশা, যদি কেউ আসে এপথে? তবে সে-ব্যাপারে সন্দেহ আছে যথেষ্ট। যা হই-চই হয়েছে, মাথামোটা গরু না হলে এপথে পানি খেতে আসার কথা নয় আর আজ রাতে কারও।

কিন্তু 'গরু' সব জায়গায়ই আছে, আমাজনের জঙ্গলেও।

ঝোপে ঘষা লাগার খসখস আওয়াজ হলো, পায়ের চাপে মটমট করে শুকনো ডাল ভাঙছে। কোন ভারি জানোয়ার আসছে। উত্তেজনায় টানটান হয়ে রইল কিশোর।

ঝোপ থেকে বেরোল জীবটা। খোলা জায়গা পেরোচ্ছে। পানি খেতে নামবে নদীতে। ঠিক এই সময় ক্যামেরার শাটার টিপে দিল কিশোর।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল জীবটা। তীব্র নীলচে আলোয় ক্ষণিকের জন্যে তার বোকাবোকা দৃষ্টি দেখতে পেল কিশোর। জীবটার মুখ এখন ক্যামেরার দিকে ফেরানো। আবার শাটার টিপল সে। আবার।

অ্যাপারচার ছোট-বড় করে তিনটে ছবি তুলেছে কিশোর। একটা অন্তত ভাল হবেই।

কোথায় যেন পড়েছে সে: *দক্ষ নেচারালিস্ট প্রথমে ছবি তুলে নেয়, তারপর লক্ষ্য করে জীবটাকে।* কারণ, আগে না তুললে পরে আর ছবি তোলার সুযোগ না-ও পাওয়া যেতে পারে। তা-ই করেছে কিশোর। টর্চ জ্বেলে আগ্রহের সঙ্গে দেখতে লাগল জীবটাকে। চোখে আলো পড়ায় অবাক হয়ে চেয়ে আছে ওটা, নড়ছেও না।

এর ছবি অনেক দেখেছে নেচারাল-হিস্টরি বইতে, চিড়িয়াখানায় জীবন্তও

দেখেছে। কিন্তু যে কোন জানোয়ারকে বনে তার নিজস্ব জায়গায় দেখার ব্যাপারই আলাদা। তাই ওটাকে দেখে অবাক না হয়ে পারল না কিশোর।

দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বড় বুনো-জানোয়ার তাপির। সামনে যেটা রয়েছে, একশো চল্লিশ কেজির কম হবে না, অনুমান করল কিশোর। ফুট পাঁচেক উঁচু, লম্বা প্রায় ছয় ফুট। বিভিন্ন জানোয়ারের দেহের নানা অংশ জোড়া দিয়ে যেন তৈরি হয়েছে। শরীরটা বিশাল এক শুয়োরের, ঘাড়ে ঘোড়ার কেশর, আর মুখের ওপরে হাতির ছোটখাটো একখান শুঁড়।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, জীবটা হাতির পূর্বপুরুষ। শুঁড়টা খুবই খাটো, কিন্তু আসল হাতির শুঁড়ের মতই ব্যবহার করে। কিশোরের মনে হলো, জীবটার নাম তাপির না হয়ে ঘোহা হওয়া উচিত ছিল, অর্থাৎ শুয়োর-ঘোড়া-হাতি।

একটা তাপির জন্যে মোটা টাকা অফার করেছে সিনসিনাটি চিড়িয়াখানা। ধরতে পারলে কাজ হয়। ধরাও হয়তো যায়—যদিও খুব কঠিন কাজ, কিন্তু নেবে কি করে? যা নৌকা নৌকা, প্রায় চার মন ওজনের জীবটাকে তোলাই যাবে না ওতে, থাক তো বয়ে নেয়া। পোর্টেবল সাইজের একটা তাপির পেলে কাজ হত।

কিশোরের ডাকে সাড়া দিয়েই যেন এসে হাজির হলো পকেট এডিশন। পকেটে ধরবে না অবশ্যই, কিন্তু ক্যানুতে জায়গা হবে।

একটা শিশু তাপির। হোঁতকা মায়ের মত ভোঁতা বাদামী রঙ নয় চামড়ার। হালকা হলুদ ডোরা আর সাদা সাদা ছোপ। বড় হলে মুছে যাবে। শিশুসুলভ গোঁ-গোঁ, কুঁতকুঁত করে মায়ের দিকে ছুটে গেল সে। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, দুধের জন্যে গলা শুকিয়ে কাঠ।

এই বাচ্চাটাকে ধরতে পারলে কাজ হয়, ভাবল কিশোর। ডাকবে নাকি সবাইকে? নাহ্, থাক। ডাকাডাকিতে যদি বাচ্চাকে নিয়ে চলে যায় মা? তার চেয়ে একা চেষ্টা করাই ভাল। তাপির সম্পর্কে যতখানি জানে কিশোর, খুব নিরীহ জীব। বিশেষ ঝামেলা করবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া দৃষ্টিশক্তি খুব দুর্বল ওদের। কিশোরকে হয়তো দেখতেই পাবে না।

নিশব্দে হ্যামক থেকে মাটিতে নামল সে। তাপির মায়ের চোখ থেকে আলো সরান না।

দ্রুত হিসেব করে নিল মনে মনে। ভয় পেলে কোনদিকে পালাতে চাইবে মা? কাছাকাছি নদী থাকলে পানিতে ডুব মারে তাপির। এটাও হয়তো নদীতেই ঝাঁপ দেবে। মায়ের মত তাড়াহুড়ো করতে পারবে না বাচ্চাটা, দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলা যাবে।

পায়ে পায়ে এগোল কিশোর। মট করে ভাঙল একটা শুকনো ডাল।

অনেক অপেক্ষা করেছে তাপির। আর করল না। সামান্য শব্দেই ওর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। কিন্তু নদীতে ঝাঁপ দিল না, বরং মাথা নিচু করে ভীমবেগে ছুটে এল আলোর দিকে। ভুলেই গিয়েছিল কিশোর, নিরীহ মাতাও সন্তানকে রক্ষার সময়

ভীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

চেঁচিয়ে উঠল মা। চেহারা আর আকারের সঙ্গে ডাকটা বড় বেশি বেমানান। মেঘের মত গুড়গুড় নয়, হাতি-কিংবা গণ্ডারের মত খনখনে ডাকও নয়, খেপা ঘোড়ার মত তীক্ষ্ণ চি-চি করে উঠল। শেষ হলো টানা লম্বা, শিসের মত শব্দে। বিচিত্র জানোয়ারটার সব কিছুই অদ্ভুত।

সবাই জেগে গেল। লাফিয়ে হ্যামক থেকে নামলেন মিস্টার আমান। রবিন আর মুসাও নামল। কবর থেকে উঠে এল বাকু, প্রথম বসন্তের সাড়া পেয়ে গর্ত থেকে বেরোল যেন শজারু। তেমন করেই গা ঝাড়া দিয়ে মাটি ফেলল শরীর থেকে।

কেউ কিছু করার আগেই কিশোরের কাছে পৌঁছে গেল চারমনী দানবটা।

টর্চ ফেলে দিয়েছে কিশোর। একটাই উপায় দেখল বাঁচার। লাফ দিয়ে মাথার ওপরের একটা ডাল ধরে উঠে যেতে চাইল। কিন্তু ভার সইল না। ডাল ভাঙল। তাপিরের পিঠের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ল সে। পতন রোধ করার জন্যে ঘাড়ের কেশর আঁকড়ে ধরল।

চকিতে মনে পড়ে গেল কথাটা। তাপিরের বড় শত্রু জাগুয়ার। পিঠে চেপে গলায় নখ বসিয়ে আঁকড়ে ধরে। তাপির তখন ছুটে যায় ঘন কাঁটাঝোপের দিকে, কিংবা নিচু মোটা ডালের দিকে। তলা দিয়ে ছুটে যায় তীব্র গতিতে। শক্ত ডালে বাড়ি লেগে অনেক সময় ছাতু হয়ে যায় জাগুয়ারের মাথা। ছিটকে পড়ে রক্তাক্ত থেঁতলানো দেহটা।

কিশোরও জাগুয়ারের মতই জীবটার পিঠে চেপেছে। এখানে কাঁটা ঝোপ নেই, তবে নিচু ডাল অনেক আছে। সে-রকম একটা ডালের দিকেই ছুটছে তাপির। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। আপনাআপনি কেশর থেকে খুলে এল আঙুলগুলো। মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গেল।

গতি রুখতে পারছে না তাপিরটা। ছুটে যাচ্ছে।

হাঁপ ছাড়ল কিশোর। যাক, অল্পের ওপর দিয়েই গেছে।

কিন্তু একথা ভেবে আরেকটা ভুল করল সে। নিরীহ মাতাও ক্রুদ্ধ হলে কতখানি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, তাপিরটা তা-ই বুঝিয়ে দিল।

কয়েক গজ এগিয়ে ব্রেক কষে দাঁড়াল সে। তারপর চোখের পলকে ঝটকা দিয়ে ঘুরল। এত মোটা থলথলে একটা শরীর নিয়ে যেভাবে ঘুরল, অবাক না হয়ে পারা যায় না। ছুটে এল যেন কালবৈশাখীর ঝড়। সেই সঙ্গে একটানা তীক্ষ্ণ শিস।

কিভাবে খাড়া হলো কিশোর, বলতে পারবে না। গুঁতো লাগে লাগে, এই সময় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল এক পাশে।

কয়েক গজ গিয়ে আবার ঘুরল জানোয়ারটা। আবার ছুটে এল। পুরোপুরি গণ্ডারের স্বভাব। শত্রুকে শেষ না করে স্বস্তি নেই।

এক সাথে দুটো টর্চের আলো এসে পড়ল তাপিরের চোখেমুখে। গর্জে উঠল রাইফেল। থরথর করে কেঁপে উঠল বনভূমি। পয়েন্ট টু-সেভেন-জিরো ক্যালিবারের

উইনচেস্টার রাইফেল থেকে বেরোনো একশো তিরিশ গ্রেন এক্সপ্যানডিং বুলেটের প্রচণ্ড আঘাতে প্রায় উল্টে পড়ল ভারি জীবটা।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। বাচ্চাটা কোথায়? এদিক-ওদিক তাকাল সে? ওই তো। মায়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ঝাঁপিয়ে পড়ল গিয়ে নিথর দেহটার ওপর। মা যে মারা গেছে, বুঝল না। শুঁড়ের মত নাক দিয়ে গুঁতো মারতে লাগল মায়ের পেটে। মনে করল বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। ওরকম তো প্রায়ই ঘুমোয় মা। তখন আরামসে শুয়ে শুয়ে দুধ খায় সে। এখনও তাই করল।

নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো কিশোরের। এ-কি করল? তার দোষেই তো মা-হারা হলো অতটুকুন দুধের বাচ্চাটা।

সবাই স্তব্ধ হয়ে দেখছে।

কিশোর চুপ, রবিন স্থির। রাইফেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার আমান।

ছুটে গিয়ে হাঁটু গেড়ে এতিম বাচ্চাটার পাশে বসে পড়ল মুসা। আস্তে করে ওটার মখমলের মত মসৃণ চামড়ায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'ভাবিসনে, খোকা। দুঃখ করিসনে। মা-তো চিরকাল কারও বেঁচে থাকে না। খুব ভাল চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাব তোকে, ভাল ভাল খাবার খেতে দেবে ওরা। তোর একলার জন্যেই সুন্দর একটা সুইমিং পুল বানিয়ে দেবে। সেখানে জাগুয়ারের ভয় নেই। আল্লার কসম, তোকে আমরা মরতে দেব না কিছুতেই।'

সাত

পরদিন সকালে আবার নৌকা ভাসাল ওরা।

ধীরে ধীরে বাড়ছে স্রোত, ঢালু হচ্ছে নদী। খানিক পরেই বোঝা গেল কারণটা। সামনে জলপ্রপাত। কাজেই বয়ে নিতে হলো নৌকা আর মালপত্র।

জলপ্রপাতের নিচ থেকে আবার শুরু হয়েছে নদী। প্রথমে মালগুলো বয়ে এনে নদীর পাড়ে রাখল ওরা। তারপর নৌকাটা বয়ে নিয়ে এল। আবার ভাসল পানিতে। মাল সাজিয়ে রেখে নৌকায় উঠল সবাই, বাকু বাদে।

পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে বাকু। দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল, 'ফিরে যান!'

বোঝাতে চাইলেন মিস্টার আমান, তর্ক করলেন, কোন লাভ হলো না। বাকুর এক কথা, ফিরে যাবে। তার চেনা অঞ্চল এখানেই শেষ। জলপ্রপাতের পর কি আছে জানে না সে, যায়নি কখনও। কোন রহস্যময় আতঙ্ক লুকিয়ে আছে ওখানে, জানে না। লোকজনকে চেনে না। শুধু শুনেছে, ওখানকার লোকেরা নাকি খুব খারাপ।

নদীর ধার বরাবর উজানে হেঁটে গেলে তার গাঁয়ে পৌঁছতে দিন দুই লাগবে।

পাওনা টাকা মিটিয়ে দিলেন মিস্টার আমান। কিছু খাবার দিতে চাইলেন।

নিল না বাকু। হেসে কাঁধে ঝোলানো ধনুকে চাপড় দিল। 'আমি খাব।' খাবার

অভাব হবে না তার। নদী আর বন থেকে জোগাড় করে নিতে পারবে।

নৌকাটা বেশি পানিতে ঠেলে দিল বাকু। দাঁড়িয়ে রয়েছে। বন্ধুদের চলে যেতে দেখে যেন খারাপ লাগছে তার।

এক টানে ক্যানুটাকে নদীর মাঝখানে নিয়ে এল স্রোত। ভাসিয়ে নিয়ে চলল। হাত নেড়ে জিভারো ভাষায় 'গুড বাই' জানাল বাকু, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। উঠতে শুরু করল প্রপাতের ধারের পাথুরে ঢাল বেয়ে। ওপরে উঠে ফিরে তাকাল আবার। আরেকবার হাত নাড়ল। তারপর-লম্বা লম্বা পা ফেলে হারিয়ে গেল বনের ভেতরে।

নিজেদের বড় একা মনে হলো অভিযাত্রীদের। একজন মাত্র চলে গেছে, ওরা রয়েছে চারজন, অথচ একা লাগছে। ভারি অদ্ভুত। বার বার প্রপাতের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। এই জঙ্গল, এই প্রকৃতি ওদের অচেনা। বাকু যতক্ষণ ছিল, কিছুটা ভরসা অন্তত ছিল। এমন এক জায়গায় রয়েছে ওরা এখন, যেখানে সভ্য মানুষ আর আসেনি। ওরাই প্রথম। সেজন্যে কিছুটা গর্বও বোধ করছে।

কথা শুরু করল মুসা।

'নাকু খেতে চাইছে।'

শুঁড়ের মত লম্বা নাকের জন্যে তাপিরের বাচ্চার নাম রেখেছে কিশোর, নাকু।

'খায় কি?' রবিনের প্রশ্ন।

'কি আর খাবে?' কিশোর বলল। 'লতাপাতা, মূল, রসাল শাকসব্জি। তবে বাচ্চাদের বোধহয় দুধ দরকার।'

'দুধ পাব কোথায়? কচি ঘাসই খাওয়াতে হবে।'

দাঁড় বেয়ে নৌকা তীরে নিয়ে এল ওরা। বালিতে ঘাঁচ করে নৌকার তলা লাগতেই তীরে নামল মুসা। ঘাসের অভাব নেই। ভাল দেখে দুই মুঠো ছিঁড়ে নিয়ে এল। বাড়িয়ে দিল নাকুর মুখের কাছে।

নাক ফিরিয়ে নিল নাকু। খাবে না।

'হুঁ, জ্বালাবে দেখছি,' চিন্তিত কণ্ঠে বললেন মিস্টার আমান।

আরেকবার ঘাস খাওয়ানোর চেষ্টা করল মুসা।

খেল তো না-ই, চাপাচাপিতে বিরক্ত হয়ে লাফিয়ে নৌকা থেকে পানিতে পড়ার চেষ্টা করল নাকু। তার গলায় বাঁধা লিয়ানা লতার রাশ টেনে ধরে থামানো হলো অনেক কষ্টে। দুলে উঠল নৌকা। আরেকটু হলেই গিয়েছিল উল্টে।

'হয়েছে, ঘাস খাওয়ানোর দরকার নেই,' হাত নাড়লেন মিস্টার আমান। 'থাক উপোস। মরবে না। পরে দেখা যাবে।' কাগজের প্যাড, পেন্সিল আর কম্পাস বের করলেন তিনি।

'নদীর ম্যাপ আঁকবেন নাকি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ।'

'আমার কাছে দিন,' উত্তেজনা চাপতে পারল না কিশোর। 'আমি দেখি চেষ্টা করে।' অজানা জায়গার ম্যাপ আঁকার মধ্যে একধরনের রোমাঞ্চ আছে। হাসলেন

মিস্টার আমান। 'গুড। নাও।'

জ্বলজ্বল করছে কিশোরের চোখ। চার দিকে তাকাল। 'কোনটা থেকে শুরু করি?…জলপ্রপাত। কি নাম দেয়া যায়?' মুসার দিকে তাকাল।

'আমি কি জানি?' দু-হাত শূন্যে তুলল মুসা।

'বাকু ফলস!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'উহু, নাকুনাপ্রপাত,' বলল কিশোর। নাকুর মায়ের সম্মানে। 'বাকু ব্যাটা তো আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। তাকে সম্মান দিতে যাব কেন?'

'ফলসের বাংলা জলপ্রপাত, না?' মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার আমান, 'ঠিক আছে, রাখো।'

কাগজের ওপর দিকে একটা চিহ্ন আঁকল কিশোর। পাশে লিখল, নাকুমাপ্রপাত।

গ্রাফপেপারে আঁকছে সে। নীল রঙের ছোট ছোট অসংখ্য বর্গক্ষেত্র আঁকা রয়েছে পেপারে। সেগুলোর ভেতর দিয়ে বাঁকা রেখা এঁকে চলল। নাকুমাপ্রপাতের পর নদীটা যত বার বাঁক কিংবা মোড় নিল, কিশোরের লাইনও ততবার মোড় আর বাঁক নিল। কোনদিকে খেয়াল নেই, কাজ করে চলেছে একমনে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে কম্পাসের দিকে। দিক মিলিয়ে নিচ্ছে। সার্ভেয়াররা কি করে কাজ করে, দেখেছে। ম্যাপও মোটামুটি আঁকতে জানে সে। অসুবিধে তেমন হলো না।

'ইস্, যন্ত্রপাতি যদি থাকত,' আফসোস করল।

সার্ভে করার যন্ত্রপাতি অনেক ভারি, ওদের পক্ষে আনা সম্ভব ছিল না। মিস্টার আমান বললেন, 'খসড়া এঁকে নিয়ে গেলে, আর কর্তৃপক্ষকে বোঝানো গেলে হয়তো সার্ভে টিম পাঠাবে।'

টিলা-পাহাড়-পর্বত কিছুই বাদ গেল না কিশোরের ম্যাপ থেকে। আনুমানিক অলটিচিউড দিয়ে রাখছে। মার্জিনের বাইরে নোট লিখে রাখছে—বন কোথায় ঘন, কোথায় রয়েছে দামী কাঠের গাছ।

সাহায্য করছেন মিস্টার আমান। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জঙ্গলের ব্যাপারে জ্ঞান দিচ্ছেন ছেলেদের।

নদীটা কোথায় চওড়া, কোথায় সরু, গভীরতা, ঢালু কতখানি, কিছুই চোখ এড়াচ্ছে না কিশোরের। আন্দাজে কাজ করতে হচ্ছে, তবু যতখানি সম্ভব নিখুঁতভাবে আঁকার চেষ্টা করছে।

উত্তেজনায় বার বার ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে তার। ভাবতে ভাল লাগছে, তার আঁকা ম্যাপের ওপর ভরসা করে হয়তো আসবে আগামী দিনের অভিযাত্রীরা। তার কথা বলাবলি করবে। হয়তো রেফারেন্স বইয়ে চিরদিনের জন্যে উঠে যাবে তার নাম। লেখা হবে : কিশোর পাশা, দা ফার্স্ট ইয়াং পাইআনিয়ার ফ্রম দা নাকুমাপ্রপাত…আর ভাবতে পারল না সে। রোমাঞ্চিত হলো শরীর।

অন্যদের যেমন তেমন, দিনটা কিশোরের ভালই কাটল। এতই তন্ময় হয়ে কাজ করল, ঘনবনে মারাত্মক শত্রু থাকতে পারে, সেকথাও মনে হলো না একবার।

বিকেলের দিকে বেশ চওড়া হয়ে এল নদী। তার মাঝে ছোট্ট একটা দ্বীপে রাত কাটানোর জন্যে ক্যাম্প করল ওরা। ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছে জায়গাটা। বনের ভেতর থেকে নরমুণ্ড শিকারী ইনডিয়ানরা এলে, তাদের অলক্ষে আসতে পারবে না।

রাতে জন্তু-জানোয়ারের কোলাহলের মাঝে ঢাকের শব্দ কানে এল বলে মনে হলো ওদের। তবে নিঃসন্দেহ হতে পারল না।

পরের দিনও একটানা চলল ক্যানু, সেই সঙ্গে চলল ম্যাপ আঁকা। ইনডিয়ানদের দেখা নেই। নাকুকেও খাওয়ানো গেল না। মাঝে মাঝেই কুঁই কুঁই করে উঠছে। খিদে পেয়েছে জানাচ্ছে, মাকে ডাকছে। ওর ব্যাপারে আর নির্লিপ্ত থাকা গেল না। এই অবস্থা চলতে থাকলে চিড়িয়াখানা দেখানো যাবে না তাকে।

সমস্যার সমাধান করল বটে মুসা, কিন্তু নাকুকে বাঁচাতে গিয়ে আরেকটু হলে সবাই মরেছিল।

একটা মোড় ঘুরে কাদাপানিতে দুটো ছাগল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওরা। পানি খেতে নেমেছে। নদীর পাড়ে খানিকটা খোলা জায়গা, তৃণভূমি। সেখানে চরছে আরও কয়েকটা ছাগল। কয়েকটা মাদীও আছে, সঙ্গে ছোট বাচ্চা। তারমানে মাগুলো একেকটা দুধের ডিপো।

'বনছাগল!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'নাকুর দুধ জোগাড় হবে।'

পানি খাওয়া বাদ দিয়ে নৌকার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছাগলদুটো। নড়ছেও না।

'উঁহু, বুনো না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'নৌকা দেখলেই পালাত তাহলে।'

'গা-টাও তো দেখছি না,' রবিন বলল।

'আছে হয়তো বনের ভেতরে কোথাও,' বললেন মিস্টার আমান।

'ওখানেই নামা দরকার,' খোলা জায়গা দেখাল মুসা। 'দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিই।'

সবাই রাজি।

নৌকা ভিড়িয়ে তীরে নামল ওরা। খাওয়া-দাওয়ার পর সামান্য জিরিয়ে নেয়ার জন্যে ঘাসের ওপরই শুয়ে পড়ল সবাই, মুসা বাদে। একটা পানির বোতল খালি করে নিয়ে পা টিপে টিপে এগোল। চরতে চরতে একটা উঁচু টিপির ওপাশে চলে গেছে ছাগলগুলো।

মিনিট পনেরো পরেই মুসার চিৎকারে লাফিয়ে উঠল তিনজনে। শাঁ করে বাতাস কেটে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা তীর।

দুধের বোতল হাতে নিয়ে লাফাতে লাফাতে আসছে মুসা। 'জলদি! তীর ছুঁড়ছে!'

চোখের পলকে নৌকায় উঠে দাঁড় বেয়ে ওটাকে মাঝনদীতে নিয়ে এল ওরা। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল তীব্র স্রোত। টেনে নিয়ে চলল ক্যানুটাকে। আরেকটা তীর উড়ে এল, কিন্তু পড়ল নৌকার পেছনে কয়েক হাত দূরে। দেখতে দেখতে

একটা মোড়ের আড়ালে চলে এল ওরা, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

বেশিক্ষণ টিকল না স্বস্তি। বাঁকের কাছে খানিকটা জায়গার ঝোপঝাড় পরিষ্কার, ঘাটে একটা ক্যানু বাঁধা।

শাঁই শাঁই করে ক্যানুটার পাশ কাটিয়ে এল ওরা। কিন্তু বড়জোর শ-পাঁচেক গজ এগিয়েই কানে এল উত্তেজিত চিৎকার। ফিরে চেয়ে দেখল, লাফিয়ে ঘাটের ক্যানুতে উঠছে তিনজন ইনডিয়ান। বাকুর গাঁয়ের মানুষের মত পোশাক পরা নয়, প্রায় উলঙ্গ।

নাকুকে দুধ খাওয়াতে গিয়ে মারাত্মক বোকামি করে ফেলেছে, ঠোঁট কামড়াচ্ছে এখন মুসা।

দাঁড়ের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে ওরা, যেন ওগুলোই তাদের এখন বাঁচার একমাত্র অবলম্বন।

তিনজনের বিরুদ্ধে চারজন। সংখ্যায় বেশি বটে, তবে সেটা হাতাহাতি লড়াইয়ের বেলায়। ইনডিয়ানদের কাছে রয়েছে বিষাক্ত তীর, রক্তে ওই বিষ ঢুকলে সর্বনাশ হবে। ওদের তীর কিংবা ডার্টগানের রেঞ্জের বাইরে থাকতে হবে। গুলি আপাতত করতে চাইছেন না মিস্টার আমান। মানুষের রক্তে কখনও হাত ভেজাননি, রেকর্ডটা ভাঙার কোন ইচ্ছে তাঁর নেই। তবে তেমন ঠেকায় পড়লে…

দ্রুত দাঁড় বেয়ে চলল চার অভিযাত্রী।

কিন্তু এসব অঞ্চল ইনডিয়ানদের পরিচিত। এখানকার নদীতে-নৌকা চালিয়ে তারা অভ্যস্ত। তাদের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় পারবে কেন বিদেশীরা? তবু চেষ্টার ত্রুটি করল না।

মাইলখানেক পর্যন্ত আগে আগে রইল ওরা, তারপর গতি কমাতে বাধ্য হলো। নিচে পানি কম, বালিতে ঠেকে যাচ্ছে নৌকার তলা। গায়ের জোরে ঠেলে নিতে হচ্ছে এখন।

প্রায় উড়ে চলে এল ইনডিয়ানদের ক্যানু। রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে গেছে। একজন দাঁড় ফেলে দিয়ে সাত ফুট লম্বা এক ধনুক হাতে খাড়া হয়ে গেল।

হুঁংকার উঠল ধনুকের ছিলায়। শিস কেটে উড়ে এল তীর।

খ্যাট করে বিঁধল নৌকার একপাশে। র‍্যাটল সাপের লেজের হিড়হিড় শব্দ তুলে কাঁপল কিছুক্ষণ তীরের পালক লাগানো পুচ্ছ, যেন জীবন্ত।

সংগ্রাহক হিসেবে কিশোর পাশা অনন্য। এই বিপদের মাঝেও ভুলে যায়নি, দুর্গম এলাকার নরমুণ্ড শিকারীদের তৈরি এরকম একটা তীর সাড়া জাগাবে শহরে দর্শকদের মাঝে, লুফে নেবে নেচারাল হিসট্রি মিউজিয়ম। আস্তে করে তীরটা খুলে নিয়ে নৌকার তলায় ফেলল সে, তারপর আবার দাঁড় তুলে নিল হাতে।

মিস হয়েছে দেখে রাগে চেঁচিয়ে উঠল ইনডিয়ানরা। আরেকটা তীর ধেয়ে এল। গলা বাঁচাতে হাত তুললেন মিস্টার আমান, তীরটা গাঁথল তাঁর ডান বাহুতে।

আর উপায় নেই। রাইফেল তুলে নিলেন তিনি। পয়েন্ট টু-সেভেন-জিরো নয়,

অন্য আরেকটা। পয়েন্ট থ্রি-জিরো-জিরো। ভোঁতা-মাথা প্রচণ্ড শক্তিশালী বুলেট, ধ্বংস-ক্ষমতার জন্যে কুখ্যাতি আছে।

হাত কাঁপছে মিস্টার আমানের। ডান বাহুতে তীক্ষ্ণ ব্যথা।

'আমাকে দাও, বাবা,' হাত বাড়াল মুসা। আগে এয়ারগান দিয়ে একটা ঘুঘুকে মারলে পড়ত তার তিনহাত দূরে বসা ঘুঘুটা, কিন্তু শুটিং ক্লাবে ভরতি হওয়ার পর হাত অনেক সোজা হয়ে গেছে তার। ছোটখাটো বাজিও জিতেছে কয়েকটা শুটিঙে।

'মেরো না,' রাইফেলটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

'না, মারব না।' ক্যানুর কিনারায় রাইফেলের নল রেখে প্রায় শুয়ে পড়ল মুসা। জংলীদের নৌকার এক পাশে পানির সমতলের একটু নিচে সই করে টিপে দিল ট্রিগার।

নীরবতা খানখান করে দিল ভারি রাইফেলের কানা-ফাটা শব্দ। নৌকার পাশে পানি ছিটকে উঠল, চেঁচিয়ে উঠল জংলীরা। ফুটো দিয়ে পানি ঢুকেছে, ডুবতে শুরু করল নৌকা।

তাড়াহুড়ো করে ডুবন্ত নৌকাটা তীরের দিকে নিয়ে চলল ইনডিয়ানরা।

'আংকেল, বেশি ব্যথা করছে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল। 'কিছু করতে হবে?'

'দাঁড় বাও। মুসা, খানিকটা লবণ দাও তো।'

অবাক চোখে তাকাল মুসা। পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি বাবা।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, লবণের কথাই বলছি।'

'মুসা, দাও জলদি,' দাঁড় বাইতে বাইতে বলল কিশোর।

হ্যাঁচকা টানে তীরটা খুলে অন্য তীরটার কাছে ফেললেন মিস্টার আমান। দুটো তীরের মাথায়ই কালচে আঠামত জিনিস মাখানো। কিউরেয়ার বিষ।

আস্তিন গুটিয়ে ওপরে তুলে দিলেন তিনি। সামান্য ক্ষত, কিন্তু যেটুকু হয়েছে তা-ই যথেষ্ট। বিষ ঢুকছে শরীরে। বেশি ঢুকলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু ঘটাবে। ইনডিয়ানরা লবণ বিশেষ খায় না, জন্তু-জানোয়ারেরা তো আরও কম খায়। তাই তাদের শরীরে কিউরেয়ার ক্রিয়া করে বেশি। কিন্তু লবণ-খেকো শহুরে মানুষকে কতখানি কাবু করতে পারবে, বলা যাচ্ছে না।

ছুরি দিয়ে কেটে ক্ষতটা বড় করলেন মিস্টার আমান। তাতে লবণ ডলতে শুরু করলেন। খানিকটা লবণ মুখে ফেলে পানি দিয়ে গিলে নিলেন।

'তোমরা বাও, থেমো, না,' প্রচণ্ড ক্লান্তি বোধ করছেন তিনি। 'আমি আর বলতে পারছি না।'

নৌকার তলায় শুয়ে পড়লেন লম্বা হয়ে।

'নৌকা তীরে ভেড়াব, আংকেল?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ভালমত শুতে পারবেন।'

'না না, ওকাজও করো না। জলদি ভাগতে হবে এখান থেকে। ভেব না, আমি

ঠিক হয়ে যাব।'

দেহের স্নায়ু আর মাংসপেশীর যোগাযোগ নষ্ট করে দেয় কিউরেয়ার। ফলে আজকাল ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় হাসপাতালে ব্যবহার হচ্ছে এই জিনিস, রোগীর পেশীর পীড়ন দূর করে তাকে ঘুম পাড়ানোর জন্যে। মিস্টার আমানেরও ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। কতখানি বিষ ঢুকেছে শরীরে, বোঝা যাচ্ছে না। ঘুম থেকে আর জাগবেন তো?

মাথা আর ঘাড়ের মাংসপেশী প্রথমে অসাড় হবে। হলোও তাই। মাথা ঘোরাতে পারছেন না মিস্টার আমান। ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামছে অসাড়তা, ছড়িয়ে পড়ছে বুকে, পিঠে, বক্ষপিঞ্জরের ফাঁকে ফাঁকে মাংসপেশীতে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু যত ব্যথাই করুক, অসুবিধে হোক, জোর করে শ্বাস টানতে হবে। ফুসফুসকে বাতাস-শূন্য হতে দেয়া চলবে না কিছুতেই। তাহলে নিশ্চিত মৃত্যু।

অবস্থা কতখানি সঙ্গিন, কিছুটা বুঝতে পারছে রবিন। কিশোর পারছে পুরোপুরিই। কিউরেয়ারের মারণ-ক্ষমতার কথা ভালমতই জানা আছে তার। মুসা জানে না। মুখ খুলতে যাচ্ছিল রবিন, কিন্তু চোখ টিপে তাকে নিষেধ করল কিশোর। ভয় পেয়ে যাবে মুসা। যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন তাদের কিছু করার নেই।

জংলীদের চেঁচামেচি কানে আসছে। বাড়ছে আস্তে আস্তে। তারমানে লোক জড় হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে যেতে হবে দূরে।

আট

ধ্রিম-ধ্রিম-ধ্রিম-ধ্রিম! ছড়িয়ে পড়েছে একটানা শব্দ।

'ঢাক!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'সতর্ক করে দিচ্ছে গাঁয়ের লোককে।'

শঙ্কিত হয়ে পেছনে ফিরে তাকাল সে, কিন্তু আর কোন ক্যানু দেখা গেল না। কে কত তাড়াতাড়ি পানিতে দাঁড় ফেলতে পারে, সেই প্রতিযোগিতা লাগিয়েছে যেন তিনজনে। তার ওপর সাহায্য করছে স্রোত।

স্রোত অবশ্য জংলীদেরকেও সহায়তা করছে।

উত্তেজিত অশ্বশাবকের মত ফুঁসছে নাকু।

'চুপ থাক, খোকা,' মুসা বলল। 'তোকে দেখার সময় নেই এখন।'

দুধের বোতলটার ওপর নজর পড়ল তার। কড়া রোদে পড়ে আছে। গরমে নষ্ট হয়ে যাবে দুধ। অনেক মূল্য দিতে হয়েছে ওর জন্যে। আরও কত দিতে হবে কে জানে। মালপত্রের ছায়ায় বোতলটা ঠেলে দিল মুসা। ভেজা রুমাল দিয়ে ঢেকে দিল।

ম্যাপের কথা ভোলেনি কিশোর। কিন্তু এখন যা অবস্থা, প্রাণ বাঁচানোই মুশকিল, থাক তো ম্যাপ আঁকা। তার সমস্ত হতাশা আর ক্ষোভ গিয়ে পড়ল যেন দাঁড়ের ওপর, গায়ের জোরে ঝপাত করে ফেলল পানিতে।

সামনে আরেক বিপদ। পানির গর্জনেই বোঝা যায় হঠাৎ ঢালু হয়ে গেছে নদীটা, অনেক গুণ বেড়ে গেছে স্রোতের তীব্রতা। রোদে লাফিয়ে উঠছে সবুজ-সাদা ঢেউ। খুব সুন্দর, কিন্তু সৌন্দর্য অনেকখানি মলিন করে দিয়েছে ঢেউয়ের নিচ থেকে হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে পড়া বড় কালো পাথরের বিষণ্ন ভোঁতা মুখ।

ফেরার সময় নেই। আর ফিরে যাবেই বা কোথায়? হড়াৎ করে এক টানে সেই তা-থৈ ঢেউয়ের মধ্যে ক্যানুটাকে ফেলল স্রোত।

প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে চরকির মত পাক খেল নৌকাটা, তারপর নাক নিচু করে ছুটে চলল ভীষণ গতিতে, আঁকাবাঁকা পথ ধরে। দানবীয় এক অজগরের মত বার বার এঁকে বেঁকে গেছে নদী, সেই পথ অনুসরণ করল নৌকা। যে কোন মুহূর্তে উল্টে যাওয়ার ভয়কে যেন তোয়াক্কাই করছে না।

বিশাল দুই পাথরের চাঁইয়ের মাঝে যেন ভাইভ দিয়ে পড়ে শেষ হয়েছে ঢাল। সরু পথ, দু-ধারে পাথরের দেয়াল। সামান্যতম এদিক ওদিক হলেই দেয়ালে বাড়ি খেয়ে চুরমার হয়ে যাবে নৌকা।

সামনের গলুইয়ের কাছে বসেছে কিশোর, মাঝে রবিন, পেছনে মুসা—নৌকা বাওয়ায় দক্ষ বলে একই সঙ্গে হাল ধরা এবং দাঁড় বাওয়ার কঠিন দায়িত্বটা নিয়েছে সে।

আতঙ্কিত চোখে গিরিপথের দিকে তাকাল কিশোর। কি করবে? দাঁড় আড়াআড়ি ধরে ঠেকানোর চেষ্টা করবে? কয়েকটা ঘটনা ঘটতে পারে তাহলে। প্রচণ্ড তাপ সইতে না পেরে দু-টুকরো হয়ে যেতে পারে দাঁড়। ধাক্কা দিয়ে চিত করে ফেলতে পারে তাকে। কিংবা ছুটে এসে বুকে বাড়ি মেরে ফেলে দিতে পারে পানিতে। তারমানে, দাঁড় দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করে লাভ হবে না।

কিশোর সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই লাফ দিয়ে গিয়ে গিরিপথের মুখে পড়ল নৌকা। শাঁ করে ঢুকে গেল ভেতরে। ভাগ্য আরেকবার পক্ষ নিল তাদের, কোন দেয়ালেই ধাক্কা লাগল না, এমনকি সামান্যতম ঘষাও নয়। স্রোতের ঠিক মাঝখান দিয়ে তীরবেগে ছুটে চলল নৌকা।

ভীষণ গর্জন, দু-পাশ দিয়ে ঝঞ্ঝার বেগে ছুটে চলেছে যেন দুটো এক্সপ্রেস ট্রেন। চাপে পড়ে পাগল হয়ে গেছে বুঝি মাতাল স্রোত, গা ঝাড়া দিয়ে পথ পরিষ্কারের চেষ্টা করছে, ফলে বৃষ্টির মত ছিটাচ্ছে পানির ছাঁট, অন্ধ করে দিতে চাইছে যেন অভিযাত্রীদের। এত ঘন ছাঁট, মনে হচ্ছে পথ জুড়ে রয়েছে সাদাটে অসংখ্য চাদর। ওই চাদরকে ছিঁড়ে-সুড়ঙ্গ তৈরি করে তার ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে ক্যানুটা।

ঢালু জায়গা সোজা হয়ে গেছে অনেক আগেই। কমতে শুরু করল স্রোতের তীব্রতা। সামনে সামান্য উঁচু হয়েছে পথ, তার গোড়ায় পানির ফেনা।

পাথরের চাঙড় পেছনে ফেলে এল নৌকা। গর্জন হঠাৎ করে অনেক কমে গেছে। সামনে পথ উঁচু, তাই স্রোতও খুব কম। দাঁড় বাইতে হচ্ছে। পানির আওয়াজ কমে যেতেই এখন আবার শোনা যাচ্ছে ঢাকের শব্দ।

'দারুণ দেখিয়েছ,' নৌকার তলায় শুয়ে দুর্বল কণ্ঠে বললেন মিস্টার আমান।

'মনে হয় ওদিক দিয়ে ঘুরে আসবে ব্যাটারা,' বলল কিশোর। 'অনেক সময় লাগাবে।'

'ওই যে, আসছে!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

ঝট করে পেছন ফিরে তাকাল কিশোর আর মুসা। ঘুরে নয়, চাঙড়ের ভেতর দিয়েই আসছে ওরাও।

অভিযাত্রীদের দেখে পানির গর্জন ছাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল জংলীরা। সোজা ছেড়ে দিয়েছে তাদের ক্যানু, ঢাল বেয়ে পড়ছে। চাঙড় দুটোর মাঝে পড়ে ক্ষণিকের জন্যে হারিয়ে গেল নৌকাটা, আবার যখন ভাসল, দেখা গেল উল্টে গেছে। ঢেউয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে তিনটে কালো মাথা।

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেরা।

কিন্তু তাদেরটা ডুবল না, ইনডিয়ানদেরটা ডুবল কেন? ওরা তো ক্যানু চালানোয় অনেক বেশি দক্ষ। কিশোর অনুমান করল, মালের বোঝা-ই তাদের নৌকাটা বাঁচিয়ে দিয়েছে। তার ওপর তলায় শুয়ে রয়েছেন মিস্টার আমান। তলা ভারি হয়ে যাওয়ার ভারসাম্য ভাল হয়েছে নৌকাটার, গড়াগড়ি করছে কম, কাত প্রায় হচ্ছেই না।

ঢালের ওপরে আরেকটা ক্যানু দেখা গেল। তার পেছনে আরেকটা। দুটোই নেমে এল ঢালের নিচে। চাঙড়ের মাঝে ঢোকার আগের মুহূর্তে শাঁই করে পাশ কেটে সরে গেল পাশের প্রণালীতে। অভিযাত্রীদের পিছু না দিয়ে আশ্চর্য দক্ষতায় পাথরে ঠেকিয়ে নৌকা আটকাল জংলীরা। উল্টে যাওয়া ক্যানুটা তুলতে শুরু করল, আর পড়ে যাওয়া তিনজনকেও।

জোরে জোরে দাঁড় বাইতে লাগল তিন গোয়েন্দা। খানিকটা সময় পাওয়া গেছে, এই সুযোগে সরে যেতে হবে যত দূরে পারা যায়।

সমান জায়গাটা পেরিয়ে এল। আবার ঢালু হতে শুরু করেছে পথ। অনেক দীর্ঘ একটা মোড় নিয়েছে নদী। তারপরে আরেক সমস্যা।

বিশাল পাহাড়ের মাঝে একটা সরু সুড়ঙ্গ, ওপরে ছাত নেই, তার মাঝে ঢুকে গেছে নদীটা। জায়গাটা ওখানে ঢালু, ফলে স্রোতের বেগ বেড়েছে। এগিয়ে গেলে ওটার মধ্যেই ঢুকতে হবে, আর কোন পথ নেই। মস্ত ঝুঁকি হয়ে যাবে সেটা। একবার সুড়ঙ্গে ঢুকে গেলে আর পিছিয়ে আসা যাবে না, পেছনে উজান। নামতে হবে ভাটির দিকে। চলে যেতে হবে শেষ মাথা পর্যন্ত। সেখানে কি আছে জানে না ওরা।

তীরে ভেড়ানোর সময় আছে এখনও। কিন্তু তাতে লাভটা কি হবে? জঙ্গলের মধ্যে ইনডিয়ানদের ফাঁকি দিয়ে একশো গজও যেতে পারবে না, তার আগেই ধরা পড়বে। ফিরে চেয়ে দেখল কিশোর, উল্টানো নৌকাটা সোজা করে ফেলেছে জংলীরা, আরোহী তিনজনও তাতে উঠে বসেছে। তাড়া করে আসবে আবার।

নাহ্, তীরে ভেড়ানো যাবে না। বেশি ভাবারও সময় নেই। দাঁড় বেয়ে এড়িয়ে চলল ওরা সুড়ঙ্গমুখের দিকে।

দূর থেকেই শোনা গেল সুড়ঙ্গের পানি ঢোকার গর্জন। পাহাড়ের পাথুরে দেয়ালে বাড়ি খাচ্ছে শব্দ, তাতে শব্দ আরও বেশি মনে হচ্ছে।

পেছনে আর একশো গজ দূরেও নেই জংলীরা, দাঁড় বেয়ে এগিয়ে আসছে দ্রুত। একনাগাড়ে চেঁচাচ্ছে। তীর ছুঁড়তে শুরু করেছে কেউ কেউ। কিন্তু রেঞ্জ পাচ্ছে না, অভিযাত্রীদের অনেক পেছনে পড়ছে তীর।

সুড়ঙ্গমুখ তো নয়, যেন হাঁ করে রয়েছে এক মহাদানব। তার কালো মুখগহ্বরে গলগল করে ঢুকছে রাশি রাশি পানি। ভাবনা-চিন্তার সময় নেই। দানবের মুখে ঢুকে পড়ল অভিযাত্রীরা, ছুটে চলল তার কণ্ঠনালী ধরে।

পেছনে আবার শোনা গেল উত্তেজিত চিৎকার। চকিতের জন্যে একবার মুখ ফেরাল কিশোর। সুড়ঙ্গে ঢোকার আগের মুহূর্তে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছে জংলীরা, ভেতরে ঢুকছে না।

'আসছে না!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'ভয় পেয়েছে।'

কিন্তু কিশোরের মুখ কালো হয়ে গেল। তলপেটে শূন্য এক ধরনের অনুভূতি, শীত শীত লাগল। কড়া রোদ থেকে আচমকা সুড়ঙ্গের ঠাণ্ডা ছায়ায় ঢোকার কারণে নয়, ভয় পেয়েছে সে। ভীষণ ভয়। ইনডিয়ানরা যেখানে ঢুকছে সাহস পায়নি, সেখানে নিশ্চয় লুকিয়ে রয়েছে ভয়ঙ্কর কিছু। হয়তো সামনে রয়েছে নিশ্চিত মৃত্যু।

কাউকে কিছু বলল না সে। চুপ করে কান পেতে শুনছে। দ্রুত পেছনে পড়ছে পানির গর্জন, সুড়ঙ্গমুখের পর থেকে আর শব্দ করছে না পানি, নিঃশব্দে বয়ে চলেছে ঢাল বেয়ে। সামান্যতম কুলকুল শব্দও নেই। স্নায়ুর ওপর দশ মন ভারি চাপ সৃষ্টি করতে থাকে যেন এই অদ্ভুত নীরবতা।

পাহাড়ের দুই দেয়ালের মাঝে মাত্র তিরিশ ফুট মত ফাঁক। খাড়া প্রায় দু-শো ফুট উঠে গেছে দেয়াল। ফিতের মত এক চিলতে নীল আকাশ চোখে পড়ে সেই ফাঁক দিয়ে। আকাশটা যেন অপরিচিত, অন্য কোন পৃথিবীর।

সোজা এগোলে এক কথা ছিল। অভিযাত্রীদের বিপদ বাড়ানোর জন্যেই যেন জায়গায় জায়গায় বাঁক নিয়েছে গিরিপথ, ছোট বড় মোড় নিয়েছে, হাল ধরে নৌকার নাক ঠিক রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে মুসা। দেয়ালের সঙ্গে নাকের একটা বাড়ি লাগলেই শেষ।

বড় আরেকটা মোড় পেরোল নৌকা।

জোরে দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ হলো। চমকে উঠল ওরা। ঝট করে তাকাল ওপরে। বাতাস, না পানির শব্দ? না, বাতাস নয়। অনেক ওপরে পাহাড়ের মাথায় গজিয়েছে পাতলা ঝোপ, লতাপাতা। নিথর হয়ে আছে। দুলছে না। তারমানে বাতাসও নয়। ফাঁকের ওপর দিয়ে সারি বেঁধে উড়ে চলেছে একদল রক্তলাল আইবিস পাখি। শব্দটা হয়তো ওরাই করেছে।

রোদ-চকচকে সেই নীল আকাশের দিকে চেয়ে কিশোরের মনে হলো, জেলহাজতের লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে লোলুপ দৃষ্টিতে মুক্ত দুনিয়া দেখছে। কয়েদীদের কেমন লাগে, অনুভব করতে পারল। এই জায়গাটা আসলেই যেন একটা জেলখানা। তাড়াতাড়ি দাঁড় ফেলল পানিতে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে যেতে চায় এই পাথরের কারাগার থেকে। সামনে যা থাকে থাকুক, পরোয়া করে না, মরলে মরবে। এই মানসিক যন্ত্রণার চেয়ে সেটা অন্তত ভাল।

গায়ে কাঁটা দিল তার। কাছেই বিষুবরেখা, গরম হওয়ার কথা, তা না হয়ে হয়েছে ঠাণ্ডা। হবেই, কারণ, দুই দেয়ালের মাঝের এই কালো ছায়ায় কোন কালেই রোদ ঢুকতে পারে না। তার কাছাকাছিই রয়েছে আরও তিনজন, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে ভীষণ একা সে, অসহায়। মিস্টার আমানের দিকে তাকাল। চোখ বন্ধ করে পড়ে রয়েছেন। ঘুম, না বেঁহুশ? মুসা আর রবিনও নীরব। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না।

অসহ্য এই নীরবতা আর সইতে পারল না মুসা। দুধের বোতলের মুখ খুলে দুধ খাওয়াতে বসল নাকুকে। একহাতে হাল ধরে রেখে আরেক হাতে বোতলটা কাত করে ধরল বাচ্চাটার মুখের কাছে। চুকচুক করে বোতলের মুখ থেকে দুধ খেতে লাগল নাকু, ভেতরে ঢুকছে সামান্যই, বেশির ভাগ গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে দুই কষ বেয়ে। খাটো বাঁকা শুঁড়টার জন্যে বোতল থেকে ঠিকমত খেতে পারছে না বেচারা। তার জিভের প্রতিটি শব্দ দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ফিরে আসছে কয়েকগুণ জোরাল হয়ে, কানে বাড়ি মারছে, যেন অশরীরী কোন প্রেতের ব্যঙ্গ-ঝড়া হাসি।

পথ এখন সোজা। কাজেই হাল ধরে রাখতে বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে না মুসার।

ভাবছে কিশোর, ভুল সিদ্ধান্ত নিল না তো? সুড়ঙ্গের বাইরে থেকে জংলীদের সঙ্গে লড়াই করাটাই কি উচিত ছিল না? ওদের কাছে বন্দুক রয়েছে, নয়জন ইনডিয়ানকে শেষ করে দিতে পারত।

কিন্তু সত্যই কি পারত? জংলীরাও বসে থাকত না, তীর ছুঁড়ত। ওই বিষমাখা তীর গায়ে গাঁথলে তাদের অবস্থাও হত মিস্টার আমানের মত। ওই তিনটে ক্যানু আর নয়জন জংলীই শেষ নয়, গাঁয়ে আরও আছে। নয়জন মরলে শতজন এসে চড়াও হত। খেপে যেত ওরা তখন। যেভাবেই হোক, ধরতই অভিযাত্রীদের।

আবার শোনা গেল দীর্ঘশ্বাস। ওপর দিকে তাকিয়ে কিছু চোখে পড়ল না।

ছোট একটা মোড় পেরোল ক্যানু। কিশোর আশা করেছিল, ওপাশে চওড়া হবে দেয়াল। তা না হয়ে হলো আরও সরু। সামনে ধীরে ধীরে সরে আসছে, গায়ে গায়ে লেগে যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে যেন। ওপরে ঝোপঝাড় বেশ ঘন, বড় গাছের চারাও আছে অনেক। দেয়াল যতই কাছাকাছি হলো, গাছের গায়ে গাছ ঠেকে গিয়ে চাঁদোয়া তৈরি করে ফেলতে লাগল। এতক্ষণও যা-ও বা আকাশ দেখা যাচ্ছিল, এখন আর তা-ও দেখা গেল না, অন্ধকার।

দুধ খাওয়ানো অনেক আগেই বাদ দিয়েছে মুসা। শক্ত হাতে হাল ধরেছে।

যতই এগোচ্ছে, ঘন হচ্ছে অন্ধকার। হাতের দাঁড়ই ভালমত দেখা যায় না।

কেন আসেনি ইনডিয়ানরা, বোঝা যাচ্ছে এখন। অবাক হয়ে ভাবছে কিশোর, পাতালনদীর সঙ্গে এর তফাৎ কতখানি?

'আরি! কি ওটা!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'কি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কি জানি গায়ে লাগল!'

ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে চারপাশে, সেই সঙ্গে অনেকগুলো দীর্ঘশ্বাস।

'বাদুড়-টাদুর হবে।'

একটা দুটো নয়, ডানার আওয়াজেই বোঝা যায়, শ-য়ে শ-য়ে। মাথা নিচু করে রাখল কিশোর, যাতে বাড়ি না লাগে। জানে যদিও, ইচ্ছে করে যদি বাড়ি না লাগায় বাদুড়েরা, লাগবে না। রাডারের মত যন্ত্র রয়েছে তাদের শরীরে, নিকষ অন্ধকারেও পথ চিনে নিতে পারে সেই যন্ত্রের সাহায্যে। কোথায় একটা খুদে পোকা লুকিয়ে রয়েছে, তা-ও বুঝতে পারে।

এই সময় কথাটা মনে পড়ল কিশোরের—ভ্যাম্পায়ার ব্যাটা নয়তো? বুকের টিপটিপানি বেড়ে গেল। শুনেছে, দক্ষিণ আমেরিকার এসব এলাকায় রক্তচোষা বাদুড়ের বাস। উষ্ণ-রক্তের প্রাণীদের দিকেই ওদের ঝোঁক।

মসৃণ কিচকিচ আওয়াজে ভরে গেছে সুড়ঙ্গ। এরই মাঝে শোনা যাচ্ছে আরেকটা শব্দ, বেশ ভারি। দূর থেকে আসা গর্জনের মত।

পানির গর্জন, কোন সন্দেহ নেই। দূরে রয়েছে এখনও।

তবে কি পাতালনদীতে পড়তে হবে শেষ অবধি? বিপদের ষোলোকলা পূর্ণ না করে ছাড়বে না দেখা যাচ্ছে পাহাড়ী নদী!

হঠাৎ মোড় নিল সুড়ঙ্গ। খ্যাঁচ করে দেয়ালে ঘষা লাগল নৌকার ধার। ধাক্কা দিয়ে ঠেলে সরাতে গিয়ে কিশোরের হাত পড়ল নরম কিছুর ওপর। ফুরফুর করে উড়ে পালাল ওগুলো। ছোট আকারের বাদুড়।

ক্যানুটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে স্রোত।

দূরে আবছা আলো চোখে পড়ল। মাথার ওপর আর আশপাশে উড়ন্ত বাদুড়গুলোর আকৃতি বোঝা যাচ্ছে এখন। যতই এগোচ্ছে নৌকা, আলো বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে পানির গর্জন।

বেরোতে পারব মনে হচ্ছে, আশা হলো রবিনের। সামনে যা-ই থাক, পেছনের ওই মৃত্যুফাঁদ থেকে ভাল, ভাবল সে।

মাথার ওপরে ফাটল শুরু হয়েছে, চোখে পড়ছে আকাশ। ওদের মনে হলো, কতযুগ পরে যেন আবার দেখা পেল ওই নীল আকাশের।

আরেকটা তীক্ষ্ণ মোড়। হুস করে হঠাৎ খোলা জায়গাটা বেরিয়ে এল নৌকা। চোখ ধাঁধিয়ে দিল তীব্র আলো। খোলা মুখে আদর করে চাপড় মারল যেন ভেজা

বিশুদ্ধ বাতাস। বড় বড় এলোমেলো ঢেউ একে অন্যের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ইলশেগুঁড়ির মত মিহি পানির কণা ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে গা।

সামনে মুখ বাড়াল মুসা। 'যাচ্ছি কোথায়?'

নদীটা যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে সামনে। খেপা ঘোড়ার মত সেদিকে ছুটে চলেছে ক্যানু। আর বড় জোর বারো-চোদ্দ গজ। তীরের দিকে নৌকা ঘোরানোর উপায় নেই।

'জলপ্রপাত!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। পানির গর্জনে ঢাকা পড়ে গেল চিৎকার।

রবিন আর মুসাও অনুমান করতে পেরেছে। জোরে জোরে উল্টো দিকে দাঁড় বাইছে ওরা, নৌকাটাকে টেনে সরিয়ে রাখতে চাইছে।

চট করে একবার বাবার দিকে তাকাল মুসা। চোখ বন্ধ করে পড়ে আছেন, চেতনা নেই যেন।

শূন্যে উঠে গেল নৌকা। ধড়াস করে আছড়ে পড়ল আবার পানিতে। মাত্র দশ গজ নিচে পড়ল। তাতে সময় আর কতটা লাগে? কিন্তু গোয়েন্দাদের মনে হলো, অনন্তকাল ধরে শূন্যে ভেসে থাকার পর যেন পড়ল। তবে মালপত্র বোঝাই ভারি একটা ক্যানুর জন্যে ওইটুকু উচ্চতাও অনেক।

ওদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়েই যেন তলিয়ে যেতে যেতেও সোজা হয়ে গেল নৌকা। হাঁপ ছাড়ল তিন গোয়েন্দা, ঢিল দিল, এবং ভুলটা করল। পাশ থেকে সজোরে এসে ধাক্কা মারল বিশাল ঢেউ, চোখের পলকে কাত করে দিল নৌকা।

একই সঙ্গে কয়েকটা ঘটনা ঘটল। পানিতে পড়েই মাথা তুলল মুসা। ভেসে যাচ্ছেন তার বাবা। পানির মধ্যে ডিগবাজি খেয়ে তাঁর কাছে চলে এল মুসা, দুই বাহুর তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে আঁকড়ে ধরল। ডুবন্ত মানুষকে কিভাবে উদ্ধার করতে হয় জানা আছে তার, স্কাউটিঙে ট্রেনিং আছে। সাঁতরে চলল তীরের দিকে।

কিশোর আর রবিন নৌকার দুই ধার দু-দিক থেকে আঁকড়ে ধরেছে। বেশির ভাগ মালপত্রই বাঁধা রয়েছে নৌকার সঙ্গে, ভেসে গেল না। ঠেলাঠেলি করে সোজা করার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, কাত হয়েই থাকল ক্যানু। সোজা করার চেষ্টা বাদ দিয়ে শেষে ওটাকে ঠেলে নিয়ে চলল ওরা।

নৌকা নিয়ে তীরে পৌঁছে দেখল, বালিতে চিত হয়ে আছে বাপ-বেটা, যেন দুটো লাশ। হাপরের মত ওঠা-নামা করছে মুসার বুক। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ছেন মিস্টার আমান; চোখ আধখোলা। ধাক্কার চোটে ঘুম ভেঙেছে, কিংবা হুঁশ ফিরেছে।

টেনে নৌকাটা শুকনোয় তুলল তিন কিশোর। জিনিসপত্র সব খুলে ছড়িয়ে দিল রোদে শুকাতে। তারপর নাকুর কথা মনে পড়ল ওদের।

যার জন্যে এত কাণ্ড, সে-ই গেল হারিয়ে। মন খারাপ হয়ে গেল ছেলেদের।

কিন্তু মন খারাপ করেছে অযথাই। পাওয়া গেল ওকে। বড় একটা পাথরের চাঙড়ের ওপাশে খুদে একটা ডোবায় পড়ে আছে নাকু। ডুবছে-ভাসছে, নাক দিয়ে পানি ছিটাচ্ছে। আছে মহাআনন্দে। এই মুহূর্তে তাকে দেখলে মনেই হবে না সে

ডাঙার জীব।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছোটবড় নানারকম পাথর। ওসবের মাঝে পরিষ্কার পানিতে গোটা দুই ক্যানুর ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল। নৌকা দুটোয় করে কারা এসেছিল—ইনডিয়ান নাকি শ্বেতাঙ্গ ভ্রমণকারী, বেঁচে ফিরে গেছে, না মারা গেছে, জানা যাবে না কোনদিন।

নাকুকে নিয়ে ফিরে এল ওরা।

সাড়া পেয়ে চোখ মেললেন মিস্টার আমান। 'থ্যাংক ইউ বয়েজ।'

নয়

মেহমান এল সে-রাতে। অভিযাত্রীরা আশা করেছিল জিভারোরা আসবে, কিন্তু এল অন্য অতিথি। নরমুণ্ড শিকারীদের চেয়ে এরা কম ভয়ঙ্কর নয়।

শুরুতেই এল সৈনিক পিঁপড়ের খুদে একটা দল। মার্চ করে এগোতে গিয়ে থমকে গেল, মুখ ঘুরিয়ে রওনা হলো মুসার দিকে। কোন কোনও মানুষের দেহে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে, কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট করে তার গন্ধ। মুসার গায়েও এই জিনিস বেশি।

মাটিতে আর শোয়া গেল না, বাধ্য হয়েই চরার কাছ থেকে ভেতরের দিকে সরে যেতে হলো সবাইকে। গাছে হ্যামক টাঙিয়ে শোয়ার জন্যে।

হ্যামকে শোয়ার পর বড় জোর ঘন্টাখানেক ঘুম, তারপরই আবার জেগে যেতে হলো। ডান পায়ের আঙুলের মাথায় খুব হালকা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল মুসা। তাতেই ঘুমটা ভাঙল তার। ছুঁয়ে দেখল আঠা আঠা লাগে।

টর্চ জেলে দেখল, তুরপুন দিয়ে যেন নিখুঁতভাবে করা হয়েছে ছোট্ট একটা ছিদ্র। সেখানে থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

'খাইছে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'জ্যান্তই খেয়ে ফেলবে নাকি!'

দুঃস্বপ্নে মানুষখেকো জংলীরা তাড়া করছিল কিশোরকে, হঠাৎ মিলিয়ে গেল সব। জেগে উঠে দেখল, ঘামে জবজবে শরীর। তাতে কোন দুঃখ নেই তার, জংলীদের কবল থেকে যে বেঁচেছে এতেই খুশি।

মুসার ক্ষতটা দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রবিন, 'হুঁ, কাঁটা ফুটেছিল।'

গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর, 'কাঁটা কই এখানে?'

হ্যামক থেকে দুর্বল কণ্ঠে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার আমান, 'এই, শুনতে পাচ্ছ তোমরা?'

অসংখ্য, অগুনতি ডানার মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে।

অন্ধকার সুড়ঙ্গের বাদুড়গুলোর কথা মনে পড়ে গেল কিশোরের। মুসার ক্ষতটার দিকে তাকিয়ে থেকে শঙ্কিত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে আপনমনেই বলল, 'বাদুড় না তো!'

'তাতে কি?' রুমাল দিয়ে রক্ত মুছছে মুসা। 'বাদুড়ে কামড়ালে আর কি হয়?'

'তাতে?' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'সাধারণ বাদুড় যদি না হয়? যদি ভ্যাম্পায়ার হয়?'

এইবার ভয় পেল মুসা। শিউরে উঠল ভূতের ভয়ে। সাংঘাতিক রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার পিশাচ ড্রাকুলার গল্প সে পড়েছে। রুমালটা পুটুলি বানিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল ক্ষতস্থানে। ককিয়ে উঠল, 'রক্ত বন্ধ হচ্ছে নাতো!'

'রবিন, আয়োডিনের বোতল বের করতে পারবে?' মুসার হাত থেকে রুমাল নিতে নিতে অনুরোধ করল কিশোর।

রুমাল দিয়ে ক্ষতের নিচে আঙুলটা শক্ত করে পেঁচিয়ে বাঁধল সে। ঘষে ঘষে আয়োডিন লাগা।

আবার শুয়ে পড়ল সবাই।

দশ মিনিটও গেল না, চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'আল্লাহ্‌রে, আজ শেষ করে ফেলবে আমাকে!'

কম্বল মুড়ি দিয়েই শুয়েছিল মুসা। ঘুমের মধ্যে সরে গেছে কম্বল। নিতম্বের কাছে খানিকটা জায়গার প্যান্ট ছেঁড়া। তুরপুন ফুটিয়ে দেয়া হয়েছে সেখানেই।

রক্ত বন্ধ করে আবার আয়োডিন লাগিয়ে দিল সেখানে কিশোর।

ডবল ভাঁজ করে কম্বল মুড়ি দিল এবার মুসা।

তার সঙ্গে আর সুবিধে করতে না পেরে অন্যদের দিকে নজর দিল তুরপুনধারীরা।

থাবা দিয়ে ধরার চেষ্টা করলেন মিস্টার আমান। একটাকেও ধরতে পারলেন না। সব পালাল।

ছোট একটা হাতে বোনা জাল বের করল কিশোর। 'জাল দিয়ে ধরব।'

'টোপ হচ্ছে কে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'তুমি,' কিশোর হাসল।

'আমি বাপু এসবে নেই। পারলে তুমি হওগে,' তাড়াতাড়ি আবার কম্বলে মুখ ঢাকল সে।

নিজেই টোপ হলো কিশোর। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল রক্তচোষা বাদুড়ের কথা।

নানারকম কথা প্রচলিত আছে রহস্যময় এই প্রাণীটাকে নিয়ে। শোনা যায়, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ভ্যাম্পায়ার। পাখার বাতাসে জাদু করে ঘুম পাড়ায় শিকারকে। তারপর রক্ত চুষে খেয়ে পালায়।

গল্পটা সত্য কিনা, যাচাই করে দেখার ইচ্ছে কিশোরের। প্রমাণ ছাড়া, যুক্তি ছাড়া কোন কথা মানতে রাজি নয় সে। হাত লম্বা করে ফেলে চুপচাপ পড়ে রয়েছে।

অনেকক্ষণ কিছুই ঘটল না।

তারপর ডানা ঝাপটানোর খুব মৃদু শব্দ কানে এল। কাছে আসছে। হালকা কিছু বুকে এসে নামল বলে মনে হলো কিশোরের। জেগে থেকেই অনুভব করতে পারছে না ঠিকমত, ঘুমের মধ্যে হলে টেরই পেত না।

আর কোন রকম নড়াচড়া নেই।

এসেই যদি থাকে, কিছু করছে না কেন ওটা? নাকি সব তার কল্পনা? কিছুই নামেনি?

কব্জির সামান্য নিচে মৃদু বাতাস লাগল জোরে নিঃশ্বাস ফেলল যেন ওখানে কেউ। ডানার বাতাস? নিশ্চিত হতে পারছে না কিশোর। মুখ ফিরিয়ে দেখতেও পারছে না, নড়লেই যদি উড়ে যায়।

কনুইয়ের দিকে সরে আসছে বাতাসটা। ফুঁ দেয়া হচ্ছে যেন ওখানটায়। বাতাসও হতে পারে।

আরও কিছুক্ষণ কাটল। কনুইয়ের উল্টোদিকে সামান্য একটু জায়গায় ঝিমঝিম শুরু হয়েছে, অসাড় হয়ে আসছে। মনে মনে চমকে গেল কিশোর। ভ্যাম্পায়ার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে পারেনি বিজ্ঞানীরা। তবে যেটুকু জেনেছেন, তাজ্জব করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। কেউ কেউ বলেন, শিকারের গায়ে এত সাবধানে ছিদ্র করে এই বাদুড়, যে শিকার সেটা টেরই পায় না। আসল ব্যাপারটা তা নয়। যেখানে ছিদ্র করে, তার চারপাশে আগেই লালা লাগিয়ে দেয় ওরা, ফলে সাময়িক ভাবে অবশ হয়ে যায় জায়গাটা। ছিদ্র করার ব্যথা টের পায় না তখন শিকার।

কিশোর কল্পনা করল, ছিদ্র হয়ে গেছে। রক্ত চোঁয়াতে শুরু করেছে। কিন্তু তবু নড়ল না।

একটু পরেই বুঝতে পারল, কল্পনা নয়, সত্যি। যেটুকু জায়গা অবশ হয়েছে, রক্ত গড়িয়ে তার বাইরে চলে আসতেই টের পাওয়া গেল। তার মানে রক্ত খাওয়া শুরু করেছে বাদুড়টা।

প্রথমবারেই অনেক জ্ঞান হয়েছে, অনেক কিছু জেনেছে। আর বেশি জানার চেষ্টা করল না। রক্ত খেয়ে পেট ভরে গেলে উড়ে যাবে বাদুড়, তার আগেই ধরতে হবে।

মনের আর বাঁ হাতের সমস্ত জোর এক করে জালটা ঘুরিয়ে এনে ফেলল সে ডান হাতের ওপর। এমন ভাবে চেপে ধরল, যাতে কোন ফাঁক না থাকে, বেরিয়ে যেতে না পারে শিকার। খুব সাবধানে আস্তে করে ডান-হাতটা সরিয়ে আনল জালের তলা দিয়ে। তারপর জালের মুখের দড়ি টেনে ফাঁস আটকে বন্ধ করে দিল থলের মুখ বন্ধ করার মত করে।

টর্চ জ্বালল।

না, কল্পনা নয়, ঠিকই। হাতের ইঞ্চি দুয়েক জায়গা জুড়ে রক্ত। থাকুক, কিছু হবে না। পরে মুছে নিলেই চলবে। জালের ভেতরে কি আছে দেখল।

ছটফট করছে কুৎসিত চেহারার একটা প্রাণী।

'ধরেছি! ধরেছি!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

লাফ দিয়ে হ্যামক থেকে নেমে এল রবিন আর মুসা।

'আরে, এ যে দেখছি একেবারে সেই লোকটার চেহারা। ওই ব্যাটাই ভূত হয়ে এল না তো!' বলে উঠল মুসা।

'কার কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'রাতে কুইটোতে যে লোকটা আমাদের পিছু নিয়েছিল।'

ভুল বলেনি মুসা, লোকটার সঙ্গে এই জীবটার চেহারার অনেক মিল।

ভ্যাম্পায়ারকে নিয়ে অনেক রোমাঞ্চকর গল্প, পিশাচকাহিনী লেখা হয়েছে। খুব জনপ্রিয় হয়েছে সেগুলো। বাদুড়টাকে দেখে সে-সব মনে পড়ছে কিশোরের। সবচেয়ে সাড়া জাগানো ভ্যাম্পায়ারের গল্প ড্রাকুলা। জীবটার চেহারা দেখে মনে হয় না, গল্পগুলোতে বাড়িয়ে বলা হয়েছে কিছু। অন্ধকারের জীব, যেন অন্ধকারে মিশিয়ে রাখার জন্যেই কালো রোমশ চামড়া দিয়েছে ওকে প্রকৃতি। লাল লাল চোখ, ছবিতে দেখা শয়তানের চোখের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভোতা নাক, খাড়া চোখা কান, চূড়ার কাছে কয়েকটা লম্বা রোম। নিচের চোয়াল ঠেলে বেরিয়ে আছে সামনের দিকে, কুৎসিত, ভীষণ কুৎসিত।

'এই, আনো তো দেখি,' ডাকলেন মিস্টার আমান। দেখেটেখে বললেন, 'হুঁ, শয়তান আর বুলডগের মাঝামাঝি চেহারা।'

হঠাৎ বিকট ভঙ্গিতে হাঁ করে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল জীবটা। বেরিয়ে পড়ল লম্বা চোখা জিভ, টকটকে লাল, তাতে রক্ত লেগে রয়েছে। দাঁত মাত্র কয়েকটা, ছোট ছোট কিন্তু ধারাল। ওপরের পাটিতে দুই দিকে দুটো শ্বদন্ত—সরু, চোখা, একেবারে যেন ড্রাকুলা ছবিতে দেখা ড্রাকুলার দাঁত, যেগুলো দিয়ে মানুষের গলা ফুটো করে রক্ত খায় ভূতটা।

বাদুড়টার মুখে রক্তের পাশাপাশি চটচটে পিচ্ছিল এক ধরনের পদার্থ লেগে রয়েছে। নিশ্চয় তার দেহ-কারখানায় তৈরি কোন সাংঘাতিক ক্রিয়াশীল অবশকারী পদার্থ মিশে আছে ওই লালায়। যা লাগলে দেহ তো অবশ হয়ই, রক্তও বেরিয়ে জমাট বাঁধতে পারে না।

হাতের দিকে তাকাল আবার কিশোর। জমাট বাঁধছে না রক্ত। চুঁইয়ে চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা এখনও বেরোচ্ছে।

খুব খারাপ এটা, বিশেষ করে ছোট ছোট প্রাণীর জন্যে। ভ্যাম্পায়ারের কামড়ে মরে না প্রাণীগুলো। বাদুড় রক্তও খায় খুব সামান্য, এটুকু রক্ত শরীর থেকে গেলে কিছুই হওয়ার কথা নয়। মরে অন্য কারণে। রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না, ক্ষত দিয়ে অনবরত বেরোতে থাকে বলে। রক্তক্ষরণে মারা যায় তার শিকার।

জোরে ডানা ঝাপটে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল বাদুড়টা। কিন্তু শক্ত জাল। একটা সুতোও ছিঁড়তে পারল না, পারবেও না।

ফলখেকো বিশাল বাদুড়ের তুলনায় এটা অনেক ছোট। ওগুলোর ডানা ছড়ালে

হয় তিন ফুট, এটা বারো ইঞ্চি হবে কিনা সন্দেহ। আর শরীরটা এতটুকুন, এই ইঞ্চি চারেক। শয়তানীর বেলায়ও এর সঙ্গে ফলখেকো বাদুড়ের কোন তুলনা হয় না।

'নিয়ে যেতে পারলে পুরো পাঁচ হাজার ডলার,' হাতের পাঁচ আঙুল দেখাল কিশোর। 'যে কোন চিড়িয়াখানাই দেবে। কিন্তু বাঁচিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই হবে মুশকিল।'

'হ্যাঁ, মুশকিলটা হবে খাওয়া নিয়ে,' বলল রবিন। 'খাওয়াবে কি?'

হেসে মুসার দিকে তাকাল কিশোর।

দুই হাত নাড়তে নাড়তে পিছিয়ে গেল মুসা, 'খবরদার, আমার দিকে চেয়ো না! আমি রক্ত দিতে পারব না।'

হেসে ফেলল সবাই।

'সে পরে দেখা যাবে।' জালটা মুসার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল কিশোর, 'ধরো এটা। রক্ত বন্ধ করি আগে। থামে তো না আর। রবিন, আয়োডিন···'

বোতল আনার জন্যে রওনা হয়ে গেল রবিন।

ভ্যাম্পায়ার তো ধরা পড়ল, সমস্যা হলো খাওয়াবে কি সেটা নিয়ে।

মিস্টার আমান পরামর্শ দিলেন, উষ্ণ রক্তের কোন প্রাণী শিকার করে আনার জন্যে।

সকালে নাস্তা সেরে শিকারে চলল তাই কিশোর আর মুসা। মিস্টার আমান দুর্বল, হ্যামকে শুয়ে রইলেন। ক্যাম্প পাহারায় রইল রবিন।

কিশোর শটগান নিয়েছে।

মুসা নিয়েছে তার বাবার পয়েন্ট টু-টু মসবার্গ রাইফেল। টেলিস্কোপ লাগানো। পনেরো গুলির ম্যাগাজিন। হাইস্পিড লং-রেঞ্জ রাইফেল বুলেট ভরা আছে তাতে। হালকা, কিন্তু বেশ শক্তিশালী অস্ত্র। এটা দিয়ে কলোরাডোতে পুমার মত জানোয়ার মেরেছেন মিস্টার আমান।

পুমা যখন মরেছে, মুসার আশা টিগ্রেও মরবে।

আধ ঘন্টা ঘোরাঘুরির পর পছন্দসই একটা জানোয়ারের দেখা পাওয়া গেল। কিশোর জানাল, ওটা ইঁদুর-গোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় প্রাণী ক্যাপিবারা। বড়গুলো আকারে ভেড়ার সমান হয়। তবে এটা অনেক ছোট, বোধহয় বাচ্চা।

একটা ঝোপে লুকিয়ে নিশানা করল মুসা। টিপে দিল ট্রিগার।

বাজ পড়ল যেন। রাইফেলের আওয়াজ সামান্যই, এত জোরে হয় না। তাহলে কে করল ওই শব্দ? মুসার ধারণা হলো ক্যাপিবারাটাই গর্জন করেছে। লুটিয়ে পড়ল ওটা।

দু-জনকেই চমকে দিয়ে ঝড় উঠল যেন ক্যাপিবারার পেছনের একটা ঝোপে। লাফিয়ে বেরিয়ে এল একটা হলদে জানোয়ার, গায়ে কালো কালো গোল ছাপ। টিগ্রে! ওটাই গর্জন করেছে। ঝোপের আড়ালে থেকে নিশানা করছিল ক্যাপিবারাটাকে। গোলমাল হয়ে গেছে দেখে গর্জন করে বেরিয়ে এক লাফে গিয়ে

ঢুকল আরেকটা ঝোপে।

আরিব্বাবা, কতবড় দানব! ক্ষিপ্রতা কি! শক্তিও নিশ্চয় তেমনি। পয়েন্ট টু-টু দিয়ে টিগ্রে মারার চিন্তা বাদ দিল মুসা। ক্যাপিবারাটাকে মারার আগে যে জাগুয়ারটাকে দেখেনি, গুলি করে বিপদে পড়েনি সে জন্যে বার বার ধন্যবাদ দিল ভাগ্যকে। এই খেলনা দিয়ে ওই দানব ঠেকাতে পারত না।

টিগ্রে চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ নড়ল না দুজনে। তারপর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে সাবধানে বেরোল। পা টিপে টিপে চলল শিকারের দিকে।

ঘাসের ওপর পড়ে রয়েছে ক্যাপিবারা। অনড়।

এদিক ওদিক চেয়ে জানোয়ারটাকে তুলল মুসা। শটগানে এল জি ভরে পাহারা দিচ্ছে কিশোর।

ক্যাপিবারা নিয়ে দু-জনে দিল ছুট। এক দৌড়ে চলে এল ক্যাম্পে।

তারের জাল, খুব সরু লোহার শিক, আর খাঁচা বানানোর অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে আসা হয়েছে। ইতিমধ্যে একটা খাঁচা প্রায় বানিয়ে ফেলেছে রবিন।

মুসা আর কিশোরও হাত লাগাল।

খাঁচা তৈরি করে তার ভেতরে ভ্যাম্পায়ারকে রাখা হলো।

'এর একটা নাম রাখা দরকার,' প্রস্তাব দিল রবিন।

'ইবলিস,' বলে উঠল মুসা।

'শুনতে ভাল্লাগে না,' কিশোর বলল।

'তাহলে কি?' ভুরু নাচাল রবিন।

'রক্তচোষা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভাল। ইংরেজি ব্লাড সাকারের চেয়ে ভাল।'

ক্যাপিবারাটাকে ভরে দেয়া হলো রক্তচোষার খাঁচায়। ঘিরে এল তিন গোয়েন্দা। কৌতূহলী চোখে দেখছে।

নড়লও না রক্তচোষা। খাঁচার কোণে উল্টো হয়ে চুপচাপ ঝুলে রইল।

নিচের ঠোঁটে বার দুই চিমটি কাটল কিশোর। বড় বেশি আলো খাঁচার ভেতর। একটা কম্বল দিয়ে ওপরটা ঢেকে দিল সে। ছায়া তৈরি করল ভেতরে।

আগের মতই ঝুলে রইল রক্তচোষা। তারপর নড়তে শুরু করল। খাঁচার জালে নখ আটকে ঝুলে ঝুলে এগোল। খুব সতর্ক। ক্যাপিবারাটার ওপরে এসে ঝুলে রইল এক মুহূর্ত। তারপর আলগোছে ছেড়ে দিল নখ। হালকা পালকের মত পড়ল ওটার ওপর। গুলির ক্ষতের কাছে রক্ত জমে আছে। আস্তে করে ওটার কাছে গিয়ে অনেকটা মাকড়সার মত জাপটে ধরল চামড়া, চেটে চেটে খেতে শুরু করল রক্ত।

হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। ব্যাপারটা তাহলে সত্যি। বেশির ভাগ লোকের ধারণা, ভ্যাম্পায়ার চুষে রক্ত খায়। কেউ কেউ অন্য কথা বলে, চেটে খায়। তাই তো করছে দেখা যাচ্ছে। কুৎসিত মুখ থেকে স্প্রিংয়ের মত ছিটকে বেরোচ্ছে যেন নীলচে-লাল জীবটা। ঢুকছে-বেরোচ্ছে, ঢুকছে-বেরোচ্ছে, সেকেণ্ডে চারবারের কম

না, অনুমান করল কিশোর। বেড়াল আর কুকুর যেমন করে তরল খাবার খায় তেমনি করে খাচ্ছে ওটা, তবে অনেক দ্রুত।

'ওর নাম রক্তচাটা হওয়া উচিত,' বলল সে।

অন্য দুজনের আপত্তি নেই।

মালপত্র গুছিয়ে আবার ক্যানু ভাসাল ওরা।

সেদিন আরেকটা জীব ধরা পড়ল।

দুপুরে খাওয়ার জন্যে নৌকা থামিয়ে নেমেছিল ওরা।

মুসা দেখল জীবটাকে। মাথার ওপর গাছে বসে চেয়ে রয়েছে ওদের দিকে। খুদে, লেজ বাদ দিলে ইঞ্চি তিনেক হবে। কয়েক আউন্স ওজন। নরম, সোনালি রোমে ঢাকা শরীর, চোখের চারপাশ আর মুখটা রাদে। সেখানটা সাদা, যেন চুরি করে টিন থেকে ময়দা খেতে গিয়ে ময়দা লাগিয়েছে।

ইশারায় কিশোর আর রবিনকে দেখাল সে। বাবাকেও দেখাল।

'পিগমি মারমোসেট,' ফিসফিসিয়ে বললেন মিস্টার আমান। 'ধরতে পারো কিনা দেখো। ভাল টাকা পাওয়া যাবে।'

বসেই আছে জীবটা। বাতাসে ডাল দুলছে, আঁকড়ে ধরে ওটাও দুলছে ধীরে ধীরে।

ব্যাগ খুলে ডার্টগান বের করল কিশোর। ডার্ট ভরল।

আগের জায়গাতেই রয়েছে মারমোসেট। অন্যান্য বানরের মতই কৌতূহলী, মানুষের কাজকর্ম দেখছে। তবে আর সব জাতভাইয়ের মত 'বানর' নয়, দুষ্টুমি নেই, লাফালাফি নেই, শান্ত-সুবোধ-লক্ষ্মী ছেলে।

'নাও, মারো,' ডার্টগানটা মুসার দিকে বাড়িয়ে দিল কিশোর। গোয়েন্দা-সহকারীর নিশানার ওপর এখন অগাধ আস্থা তার।

'তুমিই মারো,' মুসা বলল।

অনেকক্ষণ লাগিয়ে ভালমত সই করল কিশোর। ট্রিগার টিপল। ভেবেছিল লাগবে না। কিন্তু লাগল।

পাখির মত কিচির মিচির করে উঠল বানরটা। সুচের মত জিনিসটা ধরে টানাটানি শুরু করল। মুখে বিরক্তি। যেন বলছে, আহ্, কি জ্বালাতন! মানুষের জ্বালায় একটু শান্তিতে বসার জো নেই।

ক্রিয়া শুরু করেছে ঘুমের ওষুধ। টলে উঠল বানরটা। মাথা উল্টে দিল, ডাল থেকে ছুটে গেল আঙুল, খসে পড়তে শুরু করল। পেছনে সোজা হয়ে রইল লেজটা।

এতই হালকা, প্রায় নিঃশব্দে ঘাসের ওপর পড়ল জীবটা। দৌড়ে গিয়ে তুলে নিল মুসা।

ঘুম ভাঙতে বেশি সময় নিল না। চোখ মেলল মারমোসেট। চোখের ঘোলাটে তারা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হলো। লেজের সোনালি রোম ফুলে উঠল কাঠবেড়ালীর

লেজের মত। কিচমিচ শুরু করল। বিচিত্র ভঙ্গিতে মুখের ভেতর থেকে বেরোচ্ছে অদ্ভুত সাদা জিভ। গাল দিচ্ছে যেন ঃ *মানুষের বাচ্চা মানুষ, জীবনে আর বানর হবি না তোরা। একেবারে বখে গেছিস।*

হেসে আদর করে ওটার মাথায় হাত বোলাল কিশোর, 'কেমন লাগছে, ময়দাখেকো?'

ব্যস, নাম একটা হয়ে গেল মারসোসেটেরও।

'ওই খেকো-টেকো বাদ দাও,' প্রতিবাদ করল মুসা। 'খালি ময়দা।'

মুচকি হাসল কিশোর। 'ঠিক আছে, তাই সই।'

রবিন কিছু বলল না। জানে, বলে লাভ নেই। একবার মুসা বলে যখন ফেলেছে, আর পাল্টাবে না। নাম রাখার ব্যাপারে মুসার কিছু জেদ আছে। ভুল করে পুরুষ ভেবে একবার একটা কবুতরের নাম রেখে ফেলেছিল টম। যখন জানা গেল ওটা মেয়ে, তারপরও ওটার নাম টমই রইল, কিছুতেই পাল্টাতে রাজি হলো না সে।

'পৃথিবীর সবচেয়ে খুদে বানর,' বিড়বিড় করল রবিন। 'হ্যাপেইল পিগমেইয়াস।'

'কি বললে?' ভুরু কুঁচকে তাকাল মুসা।

'ওটার ল্যাটিন নাম। বৈজ্ঞানিক...'

'চুলোয় যাক ল্যাটিন। বাংলা অনেক সোজা, ময়দা। ওই হ্যাপেল-ফ্যাপেল মুখে আসবে না আমার।'

আবার ভাসল ক্যানু।

গুণ আর রূপ দিয়ে দেখতে দেখতে সবাইকে আপন করে নিল ময়দা। পাখির মত কিচমিচ করে বড় বড় লাফ মারে। একবার এর ওপর গিয়ে পড়ে, একবার ওর ওপর। কিন্তু এত হালকা সে, কারও কোন অসুবিধে হয় না।

ওর সবচেয়ে আনন্দ, কিকামুর সঙ্গে খেলা করা। ভিজে যাওয়ার পর নষ্ট হওয়ার ভয়ে বস্তা থেকে খুলে ফেলা হয়েছে ওকে। নৌকায় একটা খুঁটি বেঁধে তাতে ওর চুল বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। লম্বা কালো চুলে ঝুলে ঝুলে যেন বাতাস খায় মহাবীর। তার চুল নাড়াচাড়া করতে খুব ভালবাসে বানরটা।

নাকুর সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে ময়দার। রক্তচাটাকে দু-চোখে দেখতে পারে না। খানিক পর পরই লাফ দিয়ে গিয়ে তার খাঁচার ওপর উঠে কয়েকটা করে গাল দিয়ে আসে।

দুধের অভাবে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়েই যেন ঘাস খাওয়া শুরু করেছে নাকু। তার খাবার নিয়ে আর দুশ্চিন্তা নেই কারও।

বিকেলের দিকে রোদ যেন আগুন হয়ে উঠল। আর নৌকায় থাকতে পারল না নাকু। লাফিয়ে পড়ল পানিতে। কেউ কিছু বলল না। নৌকায় বাঁধা রয়েছে তার গলার লম্বা দড়ি। ক্যানুর পাশে-পাশে সাঁতরে চলল।

গম্ভীর হয়ে ব্যাপারটা দেখল কিছুক্ষণ ময়দা। তারও গরম লাগছে কিনা যেন

বোঝার চেষ্টা করল। তারপর দিল লাফ। পানিতে পড়েই বুঝল, মহাভুল হয়ে গেছে। এই জায়গা তার জন্যে নয়। তাড়াহুড়ো করে গিয়ে উঠল নাকুর নাকে, তারপর পিঠে, সেখান থেকে লাফ দিয়ে এসে একেবারে মুসার কোলে।

গা ঝাড়া দিয়ে রোম থেকে পানি ঝাড়ল ময়দা। ঠাণ্ডা কমছে না দেখে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল মুসার শার্টের ভেতরে। গায়ে গা ঠেকিয়ে রইল, উষ্ণতা খুঁজছে।

'দুটো ছেলে পেলে,' নৌকার তলায় শুয়ে থেকে হাসিমুখে বললেন মিস্টার আমান।

'দুটো না, তিনটে,' শুধরে দিল রবিন। 'বাদুড়টা বাদ কেন?'

'দূর!' মুখ বাঁকাল মুসা, 'ওই ইবলিসের বাপ হতে যায় কে?'

হেসে ফেলল সবাই।

দশ

'আমাজন! আমাজন! চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

অনেক বড় একটা মোড় ঘুরেই বিশাল জলরাশিতে ঝাঁপ দিল ক্যানু। মোহনায় পৌঁছে গেছে। পাক খেয়ে খেয়ে বইছে বাদামী স্রোত। কোথাও ঢেউ উটের পিঠের মত কুঁজো, কোথাও ফুলে ফুলে উঠছে সিংহের কেশরের মত। দেখেই অনুমান করা যায় স্রোতের প্রচণ্ডতা।

ম্যাপে আঁকা 'রহস্যময় বিন্দু রেখা' ধরে পাঁচ দিন চলেছে ওরা। নতুন একটা ম্যাপ যখন তৈরি হবে, ওই বিন্দুগুলো আর থাকবে না, পুরোপুরি রেখা হয়ে যাবে। মাঝখানে কিছু সময় বাদে, ম্যাপ আঁকা চালিয়ে গেছে কিশোর। যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্যে কাগজটা যত্ন করে একটা ওয়াটারপ্রুফ বোতলে ঢুকিয়ে সেটা আবার ঢুকিয়েছে ওষুধের বাক্সে।

আমাজন, পৃথিবীর বৃহত্তম নদী।

মিস্টার আমান উত্তেজিত, ছেলেরা উত্তেজিত। ক্যানুর অন্য আরোহীদের মাঝেও উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে—নদী দেখে নয় হয়তো, নৌকা বড় বেশি দোল খাচ্ছে বলেই।

তাপিরের বাচ্চা গোঁ গোঁ করল, মারমোসেট কিচমিচ করল, এমন কি তন্দ্রালু ভ্যাম্পায়ারও কর্কশ চিৎকার করে উঠল খাঁচার অন্ধকার কোণ থেকে। একমাত্র কিকামু নির্বিকার। আধবোজা চোখ মেলল না। লম্বা চুলে ঝুলে থেকে ঢেউয়ের তালে তালে খালি মাথা দোলাচ্ছে বিষণ্ন ভঙ্গিতে।

'সত্যিই এটা আমাজন!' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।

'হ্যাঁ-না দুটোই বলা যায়,' মুখ খুলল কিশোর। 'তবে হ্যাঁ বলাই ঠিক। আমেরিকান জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির ম্যাপ খুলে দেখো। দেখবে, এখান থেকে আটলান্টিক পর্যন্ত পুরোটার নামই আছে। যেমন এই অংশটার নাম ম্যারানন,

ম্যারানন নদী এসে মিশেছে বলে। পরের অংশটার নাম সলিমোজ। আসলে, সবটাই আমাজন।'

'তা, ভেলাটা বানাচ্ছি কখন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

সরু প্যাসটাজায় ইনডিয়ান ক্যানু উপযুক্ত জিনিস, সন্দেহ নেই, কিন্তু এই বিশাল পানিতে ওটা মোটেই নিরাপদ নয়। তাছাড়া ছোট্ট ক্যানুতে জানোয়ার রাখার অসুবিধে, জায়গাই নেই। দরকার, বড়সড় একটা ভেলা।

ভেলার নামও বাছাই করে ফেলেছে রবিন : নূহ নবীর বজরা। আল্লাহর আদেশে মস্ত এক বজরা বানিয়ে নাকি তাতে সব রকমের প্রাণী তুলেছিলেন তিনি। ভেসে থেকেছিলেন ভয়াবহ বন্যায়।

আলাপ-আলোচনার পর নাম ঠিক হলো শুধু 'বজরা'।

'যত তাড়াতাড়ি পারো, বানিয়ে ফেলো,' দুর্বল কণ্ঠে বললেন মিস্টার আমান। 'ক্যানুতে থাকা আর ঠিক না।'

মাইলখানেক দূরে নদীর অপর পাড় থেকে বয়ে আসছে বিশুদ্ধ হাওয়া। এক পাড় থেকে আরেক পাড়ের দূরত্ব এত বেশি, স্রোত না থাকলে নদীটাকে হ্রদ বলেই মনে হত। এপাড়ে গাছে গাছে যেন বুনোফুলের মেলা বসেছে। মাটির কাছাকাছি অগভীর পানিতে ডুবছে-ভাসছে অসংখ্য জলমুরগী। ক্যানু ওগুলোর কাছাকাছি হলেই কঁক কঁক করে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁক বেঁধে।

শটগানের দিকে হাত বাড়াল মুসা। কিন্তু বাধা দিলেন মিস্টার আমান। নৌকা দুলছে। নিশানা ঠিক হবে না।

গাছে ফুল যেমন আছে, তেমনি রয়েছে পাখি। নানা জাতের, নানা রঙের, নানা রকম আজব তাদের ডাক। জায়গাটা পাখির স্বর্গ। তীরে পানির ধারে এক আজব পাখি দেখা গেল। এক জাতের সারস, নাম তার জ্যাবিরু স্টর্ক। প্রায় মানুষের সমান লম্বা। তীর ধরে হাঁটছে গম্ভীর রাজকীয় চালে।

মোড় নিল ক্যানু। মস্ত এক বাঁক পেরিয়ে এল। তেরছা ভাবে ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ল যেন ঢেউ, আরোহীদের ভিজিয়ে দিল। স্রোতও এলোমেলো। খানিক দূরে সরু একটা খাল ঢুকে গেছে ডাঙার ভেতরে। শেষ মাথায় ছোট একটা প্রাকৃতিক পুকুর। খালে নৌকা ঢুকিয়ে দিল মুসা। চলে এল পুকুরের নিথর পানিতে।

এক চিলতে বেলাভূমি রয়েছে পুকুরের পাড়ে। ঝকঝকে মসৃণ বালি। ঘ্যাচ করে তাতে নৌকার আধখানা তুলে দিয়ে লাফিয়ে নামল তিন গোয়েন্দা। দানবীয় এক সিবা গাছের শেকড়ে বাঁধল দড়ি। এত বড় গাছ সচরাচর দেখা যায় না। প্রায় এক একর জুড়ে রয়েছে। তলায় ছোট ঘাস ছাড়া আর কিছু জন্মানোর সাহস পায়নি। সুন্দর ছায়াঢাকা একটা পার্কের মত।

ক্যাম্প করার জন্যে তো বটেই, ভেলা বানানোর জন্যেও খুব চমৎকার জায়গা। মালমসলারও অভাব নেই। পুকুরের পাড়ে রয়েছে ঘন বাঁশবন, আছে লিয়ানা লতা।

ভেলা বানাতে দুই দিন লাগল। পাকা লম্বা বাঁশ কেটে শক্ত লতা দিয়ে বাঁধা হলো। ওরকম কয়েকটা ভেলা নদীতে ভেসে যেতে দেখেছে গত দু-দিনে। ইনডিয়ানদের জলযান। আমাজনে এই ধরনের ভেলা বেশ চালু জিনিস।

'সব ভেলায়ই তো ঘর দেখলাম,' মুসা বলল। 'আমরাও একটা বানিয়ে নিই।'

বাঁশ দিয়েই তৈরি হলো ঘরের খুঁটি, চালার কাঠামো। বেড়া হলো নল-খাগড়ায়, তালপাতার ছাউনি। বাঁশের ভেলায় ভাসমান এক মজার কুটির।

বেশ বড় করে বানিয়েছে ভেলা। বড় জানোয়ার কিছুই ধরা হয়নি, জায়গার অভাব আর পরিবহনের অসুবিধের জন্যে, এবার ধরবে।

প্রথমেই ধরা পড়ল এক মস্ত ইগুয়ানা, ছয় ফুট লম্বা।

নিচু গাছের ডালে শুয়েছিল ওটা। একটা পাখিকে নিশানা করতে গিয়ে চোখে পড়ল মুসার। মাত্র বারো-তেরো ফুট দূরে।

তাজ্জব হয়ে গেল মুসা। সিনেমায় দেখা এক প্রাগৈতিহাসিক দানবের প্রতিমূর্তি যেন। সবুজ শরীর, লেজে বাদামী ডোরা পেঁচিয়ে রয়েছে। পিঠে কয়েক সারি কাঁটা, এদিক ওদিক মুখ করে আছে। থুতনির নিচেও এক গুচ্ছ কাঁটা।

ধীরে ধীরে পিছিয়ে এল মুসা, তারপর ক্যাম্পের দিকে দিল দৌড়।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বললে বিশ্বাস করবে না,' ফিসফিসিয়ে বলল মুসা। 'ডাইনোসর। গাছের ডালে।'

'ডাইনোসর? ঠিক দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'চলো তো, দেখি,' রবিন আর কিশোর দু-জনেই আগ্রহী হলো।

নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।

আগের জায়গায়ই রয়েছে জীবটা। টেরই পায়নি যেন। বোধহয় গভীর ঘুমে অচেতন।

'ইগুয়ানা!' কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব খাদে নামিয়ে বলল কিশোর। 'ধরতে পারলে কাজ হয়।'

'কিন্তু ধরি কি করে?' রবিন বলল।

'চলো, বাবাকে জিজ্ঞেস করি,' মুসা বলল।

'গলায় ফাঁস আটকাতে হবে,' শুনে বললেন মিস্টার আমান।

'ফাঁস? কাছে যেতে দেবে?' গাল চুলকালো মুসা।

'তা হয়তো দেবে, তবে ফাঁস পরাতে দেবে না সহজে।'

'তাহলে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'কাছে গিয়ে গান গাইতে হবে। আর পিঠ চুলকাতে হবে,' নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিলেন মিস্টার আমান।

'মারছে!' আড়চোখে বাবার দিকে তাকাল মুসা। বিষের ক্রিয়া নয় তো?

গোলমাল দেখা দিয়েছে মাথায়? 'গানের কি বুঝবে ওটা?'

'কি বুঝবে জানি না, তবে ইনডিয়ানরা ওভাবেই ধরে,' বললেন মিস্টার আমান।

'ঠিক,' মনে পড়ল রবিনের। 'আমিও শুনেছি···মানে, বইতে পড়েছি। 'সুরের ওপর নাকি বিশেষ মোহ আছে ইগুয়ানার, গায়ে হাত বোলানো পছন্দ করে।'

'হাত নয়, লাঠি,' বললেন মিস্টার আমান। 'লম্বা দেখে একটা লাঠি নিয়ে যাও। খুব আস্তে আস্তে বাড়ি দেবে···আমারই যেতে ইচ্ছে করছে···'

'না না, তুমি শুয়ে থাকো,' তাড়াতাড়ি বাধা দিল মুসা।

ভাল অভিনেতা কিশোর, কিন্তু গলা সাধায় একেবারে আনাড়ি। তবু তাকেই গান গাইতে হলো। দড়ির ফাঁস নিয়েছে মুসা, রবিনের হাতে লাঠি।

হেঁড়ে গলায় গান ধরল গোয়েন্দাপ্রধান। মানুষ, জানোয়ার কোন কিছুকেই আকৃষ্ট করার কথা নয় সে গান, তবু দেখা যাক ইগুয়ানার বেলায় কি ঘটে।

দূরে দাঁড়িয়ে জীবটার খসখসে চামড়ায় আলতো খোঁচা দিল রবিন। খুব আস্তে বাড়ি মারল কয়েকবার।

ফাঁস হাতে দাঁড়িয়ে আছে মুসা, উত্তেজনায় কাঁপছে।

নড়ল ইগুয়ানা। চোখ মেলল। মুখ ফিরিয়ে তাকাল অভিযাত্রীদের দিকে। প্রতিটি নড়াচড়ায় কুঁড়েমির লক্ষণ। হাঁ করে হাই তুলল। নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে চোয়াল। আঁতকে উঠল মুসা। সারি সারি ধারাল দাঁত।

গান থেমে গেল কিশোরের।

'শক্ত কামড় দেয়,' হুঁশিয়ার করল রবিন। 'তবে খারাপ ব্যবহার না করলে কিছু বলবে না। কিশোর, থামলে কেন? গাও।' বাড়ি মারা থামাল না সে। 'মুসা, তাড়াহুড়ো করো না। ঘাবড়ে দিও না ওকে। লেজ খসে গেলে কোন চিড়িয়াখানাই নেবে না।'

ভুরু কুঁচকে গেল মুসার। 'লেজ খসে যাবে?'

'হ্যাঁ, টিকটিকির মত।···ওভাবে না, ওভাবে ফাঁস পরাতে পারবে না।'

'একটা লাঠিতে বেঁধে নাও। তারপর আস্তে করে গলিয়ে দাও ওর মুখের ওপর দিয়ে।···ওকি কিশোর, গান থামাও কেন? গাও গাও।'

'মুখ ব্যথা হয়ে গেল যে।'

'চলে যাবে তো। গাও।'

লাঠি জোগাড় করে আনল মুসা। গান আর লাঠির বাড়ি সমানে চলছে। লাঠির মাথায় ফাঁসটা ঝুলিয়ে আস্তে সামনে বাড়িয়ে দিল সে। ইগুয়ানা নড়লেই থেমে যাচ্ছে তার হাত, ওটা স্থির হলেই আবার ধীরে ধীরে সামনে বাড়াচ্ছে।

ফাঁস গলার কাছাকাছি নিয়ে সাবধানে টেনে আটকে দিল মুসা। লাঠি ফেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'দিয়েছি আটকে! আর পালাতে পারবে না।'

'চুপ!' বলল কিশোর। 'টানাটানি কোরো না! লেজ খসাবে!'

দু-জনে মিলে খুব নরম হাতে দড়ি ধরে টান দিল।

গ্যাট হয়ে রইল ইগুয়ানা। দড়িতে টান বাড়ছে। মাথা ঘোরাতে শুরু করল সে। এত কুঁড়ে, নড়তেই চাইছে না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গাছ বেয়ে নেমে এল মাটিতে। পেছনে লেজের খানিক ওপরে বাড়ি মেরেই চলেছে রবিন।

চাপাচাপি করল না ওরা, কিন্তু দড়িতে ঢিলও দিল না। টেনেটুনে ক্যাম্পের কাছে নিয়ে এল ইগুয়ানাটাকে।

ভেলায় তুলতে হবে।

কাজটা অনেকখানি সহজ করে দিল ইগুয়ানা। মুসা ভেলায় উঠে টানছে। অনেক সহ্য করেছে এতক্ষণ ইগুয়ানা, আর করল না। পায়ে কামড় বসাতে ছুটে গেল। লাফ দিয়ে সরে গেল মুসা। ততক্ষণে শরীরের বেশির ভাগটাই ভেলায় উঠে গেছে জীবটার। বাকিটুকু তুলতে বিশেষ কষ্ট হলো না ছেলেদের।

ভেলা থেকে মাটিতে নেমে বসে পড়ল মুসা। যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে। 'ধরলাম তো। খাওয়াব কি?'

'সবই খায় ব্যাটা,' কিশোর বলল, 'নরম পাতা, ফল, পাখি, ছোট জানোয়ার, সব।'

তারমানে ইগুয়ানার খাবারের জন্যে ভাবতে হবে না।

সেদিনই আরেকটা প্রাণী ধরা পড়ল। ইগুয়ানার মতই ছয় ফুট লম্বা, তবে লেজ থেকে মুখ নয়, পায়ের আঙুল থেকে চাঁদি পর্যন্ত। বড়শি দিয়ে অনেকগুলো মাছ ধরে জমিয়েছে মুসা, সেগুলোর গন্ধেই পায়ে পায়ে এসে হাজির হয়েছে। জ্যাবিরু স্টর্ক, মুসার ভাষায় লম্বু 'বগা,' অর্থাৎ বক।

পাখিটাকে এগোতে দেখেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মুসা। মাছগুলো যেখানে আছে রেখে উঠে চলে এল।

লম্বা লম্বা পায়ে যেন রনপা-য় ভর করে এগিয়ে এল বিরাট পাখিটা। মাথা কাত করে গম্ভীর চোখে তাকাল মাছের ঝুড়ির দিকে। জ্যাবিরুর চেহারায় একটা ঋষি ঋষি ভাব আছে, প্রায়ই ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকে—যদিও এই ধ্যানের বেশির ভাগটাই মাংসের ভাবনায়—তাই একে দার্শনিক পাখি বলে অনেকে।

না, কিছু না, মাছ কেমন পড়েছে দেখছি শুধু—এরকম চেহারা করে মাছগুলো দেখল পাখিটা। নদী থেকে ধরার চেয়ে এখান থেকে খেয়ে ফেলা যে অনেক সহজ, বুঝতে বিন্দুমাত্র সময় লাগল না।

সত্যিই একটা রাজকীয় পাখি, ভাবল মুসা। দুধের মত সাদা পালকে ঢাকা শরীর। মাথাটা কুচকুচে কালো। লম্বা গলায় লাল রঙের আঙটি। পাখা সামান্য তুলে রেখেছে, লড়াইয়ের আগে কুস্তিগীররা যেমন বাহু তুলে রাখে অনেকটা তেমনি। মুসা আন্দাজ করল, ওটার এক ডানার মাথা থেকে আরেক ডানার মাথা সাত ফুটের কম হবে না। মানসচক্ষে দেখতে পেল, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সারসটা লস অ্যাঞ্জেলেস চিড়িয়াখানায় হেঁটে বেড়াচ্ছে রাজকীয় চালে, আর তাকে দেখার জন্যে

ভিড় জমিয়েছে অসংখ্য দর্শক।

হঠাৎ পেছন দিকে বাঁকা হয়ে গেল রনপা পা। ঝুড়িতে ঠোকর মেরে বসল সারসরাজ। দেখে যতখানি চালাক মনে হয় পাখিটাকে, আসলে তা নয়। বোকাই বলা যায়। নইলে দেখা নেই, শোনা নেই, ফেলে রাখা খাবারে এভাবে ঠোকর মারে কেউ? কত রকম বিপদের ভয় আছে।

দেখতে দেখতে খালি হয়ে গেল মাছের ঝুড়ি। মুসার ইচ্ছে ছিল, ফাঁস ছুঁড়ে ধরবে। কিন্তু সে এগোনোর আগেই মাছ খতম। খাওয়া শেষ, আর এখানে থাকার কোন কারণ নেই। ডানা মেলে উড়ে গেল জীবন্ত এরোপ্লেন।

আফসোস করল না মুসা। পাখিটার স্বভাব-চরিত্র দেখে তার যা মনে হয়েছে, অত্যন্ত লোভী, আবার আসবে। এত 'সহজ খাবারের' আশা সহজে ছাড়তে পারবে না।

আরও কিছু মাছ ধরে ঝুড়ি ভরল মুসা। ফেলে রাখল ওখানেই। ফাঁস ছুঁড়ে লম্বুকে ধরা যাবে না, বুঝে গেছে। জাল পাতল। ঝুড়ির চার পাশে আট ফুট উঁচু চারটে সরু খুঁটি পেতে তার ওপর বিছিয়ে রাখল জাল। একটা দড়ি বাঁধল জালে, এমন ভাবে, যাতে দূর থেকে ওই দড়ি টেনেই জালটা ফেলতে পারে। সিবা গাছটার অনেক শেকড় আর ঝুড়ি আছে। দড়িটা নিয়ে গেল ওগুলোর কাছে। আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল।

এই আসে এই আসে করতে করতে দিনই ফুরিয়ে গেল। পাটে বসল টকটকে লাল সূর্য। 'বগাটার' আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে মুসা, এই সময় আকাশে দেখা দিল ছড়ানো ডানা। শাঁ করে উড়ে এসে ঝুড়ির বিশ ফুট দূরে নামল লম্বুমান।

আরি! ঝুপড়ি এল কোত্থেকে!—ভাবল যেন সারসটা। আগে তো এটা ছিল না ওখানে? ভাবনা দরকার। আচ্ছা, দেখি ধ্যানে বসে। আশ্চর্য কৌশলে এক পায়ের ওপর ভারি শরীরের ভর রেখে, লম্বা ঠোঁটের আগা বুকের ফোলানো পালকে গুঁজে ধ্যানমগ্ন হলো সে।

কিন্তু সামনে লোভনীয় খাবার থাকলে ধ্যান আর কতক্ষণ? যখন দেখল, ঝুড়িও নড়ে না, ঝুপড়িটাও না, চুলোয় যাক ধ্যান বলে যেন ঠোঁট সোজা করল সে। পলকে বেরিয়ে এল আরেক পা। রনপা-য় ভর দিয়ে এগোল।

একটা মুহূর্ত দ্বিধা করল ঝুপড়ির কাছে এসে, তারপর ঢুকে পড়ল ভেতরে। খ্যাচাং করে মাছের ঝুড়িতে ঢুকে গেল চোখা ঠোঁট।

মুসাও মারল দড়ি ধরে হ্যাঁচকা টান। ঝুপ করে জালের চারদিক খুলে ছড়িয়ে পড়ল নিচে। উড়তে গেল সারস, এবং দ্বিতীয় ভুলটা করল। জড়িয়ে পড়ল জালে।

আঙুল, ডানার মাথা, ঠোঁট, ঢুকে গেল জালের খোপে। ছুটাতে গিয়ে আরও জড়াল। ছোঁড়া বালিশের তুলোর মত বাতাসে উড়তে থাকল সাদা পালক।

থামল না পাখিটা। যেভাবে ঝাপটা-ঝাপটি করছে, জাল ছিঁড়তে দেরি হবে না।

কিশোর আর রবিনও এসে দাঁড়িয়েছে।

দূরে বসে দেখছেন মিস্টার আমান। বললেন, 'জলদি পা বাঁধো।'

ছুটে গিয়ে দড়ির বাণ্ডিল নিয়ে এল মুসা।

কিশোর আর রবিন এগোল তাকে সাহায্য করতে।

প্রথমেই পেটে সারসের জঘন্য লাথি খেল রবিন। বাঁশ দিয়ে তার পেটে খোঁচা মারা হলো যেন। আউফ্ করে পেট চেপে ধরল।

লাথি খেয়ে তার জেদ গেল বেড়ে। যে পায়ে লাথি মেরেছে, সারসের সেই পাটা দু-হাতে চেপে ধরল।

দড়ির এক মাথায় গিট দিয়ে ফাঁস বানিয়ে ফেলেছে কিশোর। সেটা সারসের পায়ে পরিয়ে টেনে আটকে দিল মুসা।

জাল ছিড়ছে। ঝাড়া দিয়ে রবিনের হাত থেকে পা ছুটিয়ে নিয়ে লাফিয়ে শূন্যে উঠল সারস।

সড়াৎ করে মুসার হাত থেকে অনেকখানি দড়ি চলে গেল। জ্বালা করে উঠল হাত, চামড়া ছিলে গেছে। কিন্তু দড়ি ছাড়ল না।

রবিনও দড়ি চেপে ধরল।

ক্ষণিকের জন্যে মনে হলো ওদের, সিন্দবাদ নাবিকের রুক পাখির মত উড়িয়ে নিয়ে যাবে লম্বু বগা। আঙুল ঢিল করে দড়ি ছাড়তে লাগল।

শাঁই শাঁই করে উড়ে গেল সারস। পঞ্চাশ ফুট উঠে শেষ হয়ে গেল দড়ি, ঝটকা দিয়ে টানটান হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে দড়ির অন্য মাথাটা নিয়ে গিয়ে ভেলার একটা খুঁটিতে বেঁধে ফেলেছে কিশোর। উঁচুতে আর উঠতে না পেরে চক্কর দিয়ে উড়তে লাগল পাখিটা। ভয় আর বিস্ময় ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে দিচ্ছে না যেন তাকে।

কিন্তু খানিক পরেই ভয়-ডর সব চলে গেল। অবাক হয়ে যেন ভাবল সারস, 'আমি না জ্যাবিরু? এত ভয় পাওয়া কি আমার সাজে?' দ্রুত নামতে শুরু করল সে। ভেলা আলো করে জুড়ে বসল। গম্ভীর ভঙ্গিতে একবার এদিক একবার ওদিক তাকিয়ে আশপাশের সবাইকে তুচ্ছজ্ঞান করল। যেন বলল, 'ভয় আমি পাইনি, তোমাদেরকে চমকে দিতে চেয়েছিলাম। যাকগে, অনেক হয়েছে। এবার খানিক ধ্যানমগ্ন হই। খবরদার, আমাকে বিরক্ত করবে না।'

বেশবাস ঠিক করল সে। ঝাড়া দিয়ে আলগা পালক ঝড়িয়ে ফেলল, ঠোঁট দিয়ে ডলে সমান করল এলোমেলো হয়ে থাকা পালক। একটা পা গুটিয়ে লুকিয়ে ফেলল ডানার তলায়। তারপর আরেক পায়ে ভর রেখে দাঁড়িয়ে ঠোঁট গুঁজল বুকের পালকে। ধ্যানমগ্ন হলেন দার্শনিক।

পরদিন সকালে আমাজনে 'বজরা' ভাসাল অভিযাত্রীরা।

কিশোর সাজল ক্যাপ্টেন, মুসা ফার্স্ট মেট, আর রবিন স্টুয়ার্ড। মিস্টার আমানের দুর্বলতা কাটছে না চিন্তিত হয়ে পড়েছে ছেলেরা। বিষের ক্রিয়া কাটেনি যে এটা পরিষ্কার। তাঁকে নিয়ে কি করবে বুঝতে পারছে না ওরা।

সাগরে চলেছে স্রোত, ভেলাও চলেছে সেদিকে।

বিচিত্র সব যাত্রী : তাপিরছানা, ভ্যাম্পায়ার, পুঁচকে বানর মারমোসেট, দানব ইগুয়ানা, দার্শনিক জ্যাবিরু, চারজন হোমো স্যাপিয়েনস (মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম), আর মহাবীর কিকামুর মমি করা শুকনো মাথা।

নাকু এখন ঘাসই খায়, কচি পাতাও খায়। রক্তচাটা বেশ ঝামেলা করে, গরম রক্ত না হলে তার চলে না। ফলে দিনে অন্তত একবার তীরে নেমে ছোট জানোয়ার শিকার করতে হয় মুসাকে। জাতভাই অন্য বানরের মত শব্জি আর ফল ভালবাসে না ময়দা, পোকামাকড় আর ছোট গিরগিটি না পেলে মুখ ভার করে রাখে। ডাইনোসরকে (ইগুয়ানাটার নাম) নিয়ে ভাবনা নেই। পাতা, ফল মাংস সবই খায়। আর লম্বুর জন্যে তো রোজই ঈদ। মাছের অভাব নেই নদীতে। ভেলার কিনারে দাঁড়িয়ে নিজেও ধরে, বড়শি ফেলে মুসাও ধরে দেয়।

দিনে চলে, রাতে ভেলা তীরে ভিড়িয়ে কোন গাছের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে তারপর ঘুমায় অভিযাত্রীরা। মাঝেসাঝে দু-একটা ভেলা দূর দিয়ে চলে যেতে দেখে। ইনডিয়ানদের ভেলা। নদীর পাড়ে কোন গ্রাম চোখে পড়ে না, খালি জঙ্গল। কোথা থেকে আসে ইনডিয়ানরা, কোথায় যায় ওরাই জানে। অভিযাত্রীদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

মিস্টার আমানের অবস্থা আরও খারাপ হলো। উঠতেই পারেন না এখন।

এই সময় একদিন সকালে দেখা গেল শহর।

এগারো

খুদে শহর, কিন্তু দীর্ঘ দিন শুধু জঙ্গল দেখে দেখে ওটাকেই নিউইয়র্ক নগরী বলে মনে হলো ওদের। শহরটার নাম ইকিটোজ।

তাদের যাত্রাপথে এটাই শেষ শহর। সামনে একটানা গহীন অরণ্য, নদীর দুই তীরেই।

জেটিতে ভিড়ে একটা খুঁটিতে ভেলা বাঁধল ওরা। শতশত ছোটবড় নৌকা রয়েছে ঘাটে। প্রায় সবাই মাল নিয়ে এসেছে। খালাস করা হচ্ছে রবার, তামাক, তুলা, কাঠ, নানা রকমের বাদাম।

সীমান্ত শহর। বেশির ভাগই কলকারখানা। কাঠের মিল, জাহাজ আর নৌকা মেরামতের ডকইয়ার্ড, সুতার কল, যন্ত্রপাতি মেরামতের কারখানা আছে। আর আছে মদ চোলাইয়ের বিশাল কারখানা—আখের রস থেকে রাম তৈরি করে। কাস্টমস আছে, মিউনিসিপ্যালিটি আছে, একটা সিনেমা হলও আছে। বিকেলের দিকে শহর ঘুরতে গিয়ে ছেলেরা দেখল, তাতে চলছে অনেক পুরানো একটা ছবি। কয়েক বছর আগেই রকি বীচে দেখে ফেলেছে ওটা ওরা।

ভেলায় ফিরে দেখল, নির্জীব হয়ে পড়ে আছেন মিস্টার আমান। ছেলেদের

সাড়া পেয়ে চোখ মেললেন। বললেন, 'আমাদের বোধহয় বাড়িই ফিরে যেতে হবে।'

কেন যেতে হবে, বলতে হলো না, বুঝল ছেলেরা। হাসপাতাল ছাড়া ভাল হবেন না মিস্টার আমান।

মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনিবারে প্লেন ছাড়ে ইকিটোজ থেকে। কাল সকালেই একটা ছাড়বে। যেতে হলে কালই যাওয়া দরকার।

মাঝরাত পর্যন্ত গুজগুজ ফিসফাস করল ছেলেরা।

ভোরে সূর্য ওঠার আগেই ছেলেদের ডেকে তুললেন মিস্টার আমান। তাড়াতাড়ি নাস্তা সেরে টিকেট কাটতে যেতে বললেন।

খেতে খেতে মুসা বলল, 'বাবা, একটা টিকেট কাটলেই চলবে।'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে তাকালেন মিস্টার আমান। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে চেহারা। অনেকগুলো ভাঁজ পড়া কপালে।

বাবার জন্যে কষ্ট হলো মুসার। 'আমরা থেকে যাই। শেষ করেই যাই কাজটা।'

'না, পারবে না। তোমরা সবাই ছেলেমানুষ।'

'কেন পারব না, আংকেল?' কিশোর বলল, 'আমরা তো চালিয়ে এসেছি এযাবত। পারব না কেন? কয়েকজন লোক ভাড়া করে নেব শুধু।'

হাসলেন মিস্টার আমান। শুকনো ঠোঁটে দুর্বল দেখাল হাসিটা। 'কিন্তু সামনে গভীর জঙ্গল…'

'তাতে কি?' মুসা জিজ্ঞেস করল, 'যা পেরিয়ে এসেছি, তার চেয়ে বেশি বিপদ হবে? বাবা, ভেবে দেখো, তোমার জমানো টাকা প্রায় সব খরচ করেছ এই অভিযানের পেছনে। কাজ শেষ করে যেতে না পারলে ফকির হয়ে যাবে। অতগুলো টাকা জমাতে কত বছর সময় লাগবে আবার? শোধ করবে কিভাবে? যে কটা জানোয়ার ধরেছি, বিক্রি করে ধারই শোধ করতে পারবে না…'

'সবই বুঝি। কিন্তু তোমরা ছেলেমানুষ…'

'ছেলে ছেলে করছ কেন? এতখানি যখন আসতে পেরেছি বাকিটাও যেতে পারব,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল মুসা।

'কিন্তু কিশোরের চাচী আর তোমার মাকে কি বলব? রবিনের বাবা-মাকে হয়তো বোঝাতে পারব…'

'কি আর বলবে? মা বকবক করবে, তুমি চুপ করে থাকবে।'

'হ্যাঁ,' হাসল কিশোর। 'আমরা ঠিকমত ফিরে গেলেই তো হলো। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। আর মেরিচাচীর বকা আপাতত আপনাকে খেতে হবে না। চাচার ঘুম হারাম করে দেবে। দিকগে, আপনার কি? তাছাড়া এখনই আপনাকে পাচ্ছে কোথায় ওরা? আপনি তো থাকবেন হাসপাতালে।'

ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল মিস্টার আমানের। হাসিটা অবিকল মুসার

মত। বাপ-ছেলে দু-জনেই একরকম করে হাসে। 'গভীর ষড়যন্ত্র! হাহ্ হা---কিন্তু দেখো ছেলেরা, আমাকে কথা দিতে হবে, জ্যান্ত ফিরে যাবে তোমরা। যদি তা না পারো, আমাকে খামোকা ফেরত পাঠিও না। হাসপাতাল থেকে হয়তো বেঁচে ফিরব, কিন্তু আমি শিওর, তারপর খুন করা হবে আমাকে।'

হাসল সবাই।

সেদিন সকালের প্লেনেই চলে গেলেন মিস্টার আমান।

বারো

চেয়েই রইল ছে ন্মরা। দিগন্তে বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল প্লেনটা।

ফিরে তাক ল ওরা পরস্পরের দিকে। বিষণ্ণ। বড় একা লাগছে। ভীষণ অরণ্যের বিরুদ্ধে ওর তিন কিশোর। খানিক আগে মিস্টার আমানকে বলা বড় বড় কথাগুলো এখন অর্থহীন মনে হচ্ছে ওদের।

'কিছু হবে না,' বলল কিশোর, নিজেকেই সান্ত্বনা দিচ্ছে। 'মুণ্ডুশিকারীদের সামনে না পড়লেই হলো। কয়েকটা জন্তুজানোয়ার ধরা তো। পারব। আমাজনের অনেকখানি চেনা হয়ে গেছে আ মাদের।'

ঘাটে ফিরে এল ওরা।

আগের জায়গায়ই বাঁধা রয়েছে ভেলাটা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। কেন যেন মনে হচ্ছিল তার, জায়গামত পাবে না ওটা।

ওরা ভেলার দিকে যেতেই এগিয়ে এল একজন পুলিশ

উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে আর হাত নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণ ক রল।

ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ আর পর্তুগীজ শিখে ফেলেছে এতদিনে কিশোর। লোকটার কথার তুবড়ি থেকে যতটুকু উদ্ধার করতে পারল তা হলো, ওদের অনুপস্থিতিতে নৌকা করে কয়েকজন লোক এসে ভেলার দড়ি খুলতে শুরু করেছিল।

লোগুলোর হাবভাবে সন্দেহ হয়েছিল পুলিশ কনস্টেবলের, চ্যালেঞ্জ করেছিল। নৌকার একজন জবাব দিয়েছে, সে ভেলার 'একজন' মালিক। এখানে সুবিধে হচ্ছে না, নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিতে চায়। সন্দেহ আরও বেড়েছে পুলিশম্যানের। তর্কাতর্কি করেছে। শেষে সাফ বলে দিয়েছে, অন্য মালিকরাও আসুক, তারপর ভেলার দড়ি খুলতে দেবে।

অপেক্ষা করতে রাজি হয়নি লোকটা। পরে আসবে বলে নৌকা নিয়ে চলে গেছে।

লোকটার চেহারার বর্ণনা চাইল কিশোর।

কনস্টেবল যা বলল, তাতে বোঝা গেল, লোকটা বিশালদেহী, খারাপ চেহারা এবং 'নো জেন্টলম্যান'। ইংরেজির টানে স্প্যানিশ বলে।

কনস্টেবলের হাতে একটা ডলার গুঁজে দিল কিশোর। খুশিতে ময়লা দাঁত সব বেড়িয়ে পড়ল লোকটার।

মুসা আর রবিনকে ভেলা পাহারায় রেখে থানায় গেল কিশোর ডায়রি করাতে। থানার লোকেরা হেসেই উড়িয়ে দিল।

'ভুল করেছে আরকি,' বলল চীফ। 'যাও তুমি, আবার কোন গোলমাল হলে এসে বলো।'

পরিষ্কার বুঝল কিশোর, আবার কিছু হলে তাদেরকেই সামলাতে হবে, পুলিশের সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। ইউ এস কনসালের সঙ্গে দেখা করল সে। খুলে বলল সব।

'শুধু চেহারার ওই বর্ণনা দিয়ে এখানে ধরা যাবে না কাউকে,' কনসাল বললেন। 'ওরকম চেহারার অনেক আছে। দেখো, তোমরা যদি খুঁজে বের করতে পারো। কিন্তু তাহলেও কিছু করার নেই। ওর বিরুদ্ধে কোন কিছু খাড়া করতে পারবে না, কোন প্রমাণ নেই তোমাদের হাতে। দড়ি খুলতে এসেছিল, কনস্টেবল মানা করায় চলে গেছে। জেলে যাওয়ার মত কিছুই করেনি সে। কোন অ্যাকশন না নিয়ে ঠিকই করেছে পুলিশ। ধরলেও আবার ছেড়ে দিতে হত। সেক্ষেত্রে আরও বেপরোয়া হয়ে যেত তোমাদের ভিলেন।'

ঠিকই বলেছেন কনসাল। কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে আপনার পরামর্শ কি?'

'বলব? মিস্টার আমানের পথ ধরো। প্লেনে চড়ে সোজা বাড়ি চলে যাও। বুঝতে পারছি, তোমাদের শত্রু আছে এখানে। জানোয়ারগুলোর অনেক দাম। চোর-ডাকাতের চোখ তো পড়বেই। এখানে ওদের অভাবও নেই। গলাকাটা ডাকাত অনেক আছে। ইকিটোজে যতক্ষণ আছ, আইনের সাহায্য পাবে, সে-ব্যবস্থা করতে পারব। কিন্তু জঙ্গলে পুলিশ যাবে না। সেখানে একটাই আইন : হয় মারো, নয় মরো। সেটা অভিজ্ঞ পুরুষমানুষের কাজ, তোমরা ছেলেমানুষ, টিকতে পারবে না।'

'ছেলেমানুষ' শুনতে শুনতে কান পচে গেছে কিশোরের। মনে মনে রেগে গেল। পেয়েছে কি বুড়োরা? বয়েস কম হতে পারে, কিন্তু যে কোন বড়মানুষের চেয়ে কম কি ওরা? আর শিখতে শিখতেই ছেলেরা বড় হয়, অনভিজ্ঞরা অভিজ্ঞ হয়।

'অনেক ধন্যবাদ,' গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। 'কারও সাহায্য পাই আর না পাই, কাজ চালিয়ে যাব আমরা, কেউ ঠেকাতে পারবে না। আজতক পারেনি কেউ।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন কনসাল। হাসি ফুটল ধীরে ধীরে। 'খুব জেদি ছেলে। ওরকম মনোবল থাকা ভাল। গুড লাক।'

কনসালের অফিস থেকে বেরোল কিশোর।

জেটিতে পৌঁছে দেখল ভেলায় টহল দিচ্ছে রবিন আর মুসা। দু-জনের হাতেই

রাইফেল। মুসার কোমরের ডান পাশে ঝোলানো খাপে ভরা পিস্তল, তার বাবার কোল্ট ·৪৫. বাঁ পাশে বিরাট ছুরি। রবিনের কোমরে শুধু ছুরি। 'ভেলার কাছে খালি এসে দেখো, দেখাব মজা!'— এমনি ভাবভঙ্গি।

আসলে ভয়ে কাতর হয়ে আছে দু-জনে। কিশোরকে দেখে হাঁপ ছাড়ল।

'কাজ হলো?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'না। যা করার আমাদেরই করতে হবে।'

'সে-ভয়ই করছি। পারব?'

'দেখা যাক পারি কিনা। আগে থেকেই কেঁচো হয়ে গিয়ে লাভ নেই।'

যাত্রার জন্যে তৈরি হতে লাগল ওরা।

নদীর উজানে ভেলা দিয়ে মোটামুটি কাজ চলেছে। কিন্তু ভাটিতে যেখানে স্রোত বেশি, ঝড়তুফানেরও ভয়, সেখানে এই জিনিস টিকবে না। ভাল, বড় নৌকা দরকার। জাগুয়ার কিংবা অ্যানাকোণ্ডার মত বড় ভারি জীব রাখতে হলে অনেক বেশি জায়গা প্রয়োজন। আর বড় নৌকা চালানোর জন্যে মাল্লাও লাগবে।

সেই পুলিশ কনস্টেবলকে আবার দেখা গেল জেটির কাছে। বোধহয় আবার ডিউটি পড়েছে এদিকে। মুসা আর রবিনকে ভেলায় রেখে তীরে উঠল কিশোর। পুলিশম্যানকে ভেলার দিকে নজর রাখতে বলে চলল ডকইয়ার্ডের অফিসে, নৌকা কিনতে।

ম্যানেজার লোক খুব ভাল। সহজেই বোঝানো গেল তাকে, কি জিনিস চায় কিশোর। একটা নৌকা দেখাল।

নৌকা বা জাহাজের ব্যাপারে বাস্তব ধারণা প্রায় নেই কিশোরের, শুধু বই পড়ে যা জেনেছে। তবু দেখেই বুঝল, এই জিনিসই তাদের দরকার।

নৌকাটা পঞ্চাশ ফুট লম্বা। খুবই মজবুত। এর স্থানীয় নাম ব্যাটালাও। সামনের গলুইয়ের কাছে কিছুটা বাদ দিয়ে পুরো নৌকার ওপরেই ছাত, ঘরের মত। একে বলে টলডো। বাংলাদেশী বজরার ছবি দেখেছে কিশোর, এই নৌকাটাও অনেকটা বজরার মতই। তাই এর নাম রাখল 'বড় বজরা'।

বেশ চওড়া বড় বজরা, পেটের কাছে প্রায় দশ ফুট। পেছনে হালের কাছে একটা উঁচু মঞ্চ। ওখানে দাঁড়িয়ে হাল ধরে মাঝি। আশপাশ তো বটেই, ছাতের ওপর দিয়ে সামনের দিকেও নজর রাখা যায় ওখানে থেকে। চারটে দাঁড়ের ব্যবস্থা রয়েছে, একসঙ্গে দাঁড় টানতে পারবে চারজন মাল্লা। বাড়তি পাটাতনমত রয়েছে নৌকায় দুই ধারে। ওগুলো থাকাতে অল্প পানিতে লগি বেয়ে যাওয়া যাবে।

নৌকাটা কিনল কিশোর পঁচিশ ফুট লম্বা আরেকটা ছোট নৌকা কিনল, ওটার স্থানীয় নাম মনটারিয়া। সে নাম দিল 'ছোট বজরা'। বড় বজরার মত এর ওপরেও টলডো রয়েছে। হালকা বলে বড়টার চেয়ে জোরে ছুটতে পারে।

ডকইয়ার্ডের ম্যানেজারই মাল্লা জোগাড় করে দিল। ছয় জন। নৌকা বাইবে ওরা, জানোয়ার ধরায়ও সাহায্য করবে। পাঁচজন ইনডিয়ান, আর অন্য লোকটা

ক্যাবোক্লো—ইনডিয়ান ও পর্তুগীজের মিশ্র রক্ত; তার নাম জিবা।

ভেলার আর দরকার নেই, কিন্তু ক্যানুটা ফেলল না কিশোর। ওটাতে করেই এতদূর এসেছে। কাজের জিনিস। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। দুই বজরার সঙ্গে বেঁধে নিল ওটাও।

সামনে দীর্ঘ যাত্রা। তিন গোয়েন্দা উত্তেজিত। ভেলার পাশে বজরা বেঁধে ওগুলোতে মাল আর জানোয়ার তুলতে শুরু করল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আলো থাকতে থাকতেই কাজ শেষ করতে চায় কিশোর। পরদিন খুব ভোরে উঠে রওনা দেবে।

ঘাটে অনেক দর্শক জমেছে। জানোয়ার তোলা দেখছে ওরা, মাঝেমাঝে দু-একটা পরামর্শও দিচ্ছে। তাপিরের বাচ্চা, বানর আর বাদুড় তোলাটা কিছুই না। ঝামেলা করল ইগুয়ানা। নড়তে চায় না। ওটাকে বেশি চাপাচাপিও করা যায় না, লেজ খসে যায় যদি?

যা-ই হোক, তোলা গেল অবশেষে।

হাঁকডাকে জাবিরু গেল ঘাবড়ে। উড়ে গেল ওটা। পায়ে বাঁধা পঞ্চাশ ফুট দড়িতে হ্যাঁচকা টান লাগতেই ওপরে উঠা থামিয়ে চক্কর দিয়ে উড়তে শুরু করল। দড়ি ধরে ধীরে ধীরে টেনে নামিয়ে আনা হলো ওটাকে।

কাজ প্রায় শেষ, ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল বিশালদেহী এক লোক। ভেলায় এসে উঠল।

দেখামাত্র চিনল ওকে কিশোর আর মুসা। অন্ধকার হয়ে গেছে। আরও ভালমত দেখার জন্যে লোকটার মুখে টর্চের আলো ফেলল কিশোর। না, কোন ভুল নেই। সেই লোকটাই। চোখা কান। কুৎসিত নিষ্ঠুর চেহারা।

'হাল্লো,' বলল কিশোর। 'আপনাকে কোথাও দেখেছি মনে হয়?'

'হ্যাঁ। কুইটোতে। গির্জা খুঁজছিলাম।'

'মোম নিশ্চয় জ্বেলেছেন?'

'মিছে কথা বলেছি। আসলে তোমাদের পিছুই নিয়েছিলাম।'

'আজ ভেলার দড়ি কে খুলতে এসেছিল? আপনি?'

'ভুল করেছিলাম। আমাদের ভেলা ভেবেছিলাম।'

'নিশ্চয়,' টিটকারির ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। 'তা আপনার নামই তো জানা হলো না এখনও।'

হাসল লোকটা। 'নাম? নাম জেনে আর কি হবে? বন্ধু বলে ডাকতে পারো।' দাঁত বের করে হাসল আবার লোকটা। সরু চোখা দাঁত, ওপরের পাটিতে দুদিকের দুটো দাঁতের মাথা এত চোখা ও লম্বা, শ্বদন্ত বলেই ভুল হয়।

'হুঁ,' মাথা দোলাল আবার কিশোর। 'নাম একটা আমিই দিই আপনার। ভ্যাম্পায়ার। সংক্ষেপে ভ্যাম্প। তা কি করতে পারি আপনার জন্যে?'

'দেখো,' কণ্ঠস্বর বদলে গেল লোকটার, হাসি হাসি ভাবটা আর নেই,

'গোলমাল করতে চাই না। একটা চুক্তিতে আসা যাক।'

'কার তরফ থেকে? মার্শ গ্যাম্বল?' অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল কিশোর। ওই লোকটাই লস অ্যাঞ্জেলেসে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী জানোয়ার ব্যবসায়ী।

চমকে উঠল ভ্যাম্প, চোখে বিস্ময়। 'কার কথা বলছ?'

'ভালমতই জানেন, কার কথা বলছি। আপনার মত আরেকটা ভ্যাম্প। নিজের মুরোদ নেই, জানোয়ার ধরার জন্যে লোক রেখেছে। বোঝাই যাচ্ছে, ঠকায় ওদেরকে, ফলে পছন্দসই জানোয়ার পায় না। এখন আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার হলো, অন্যের জিনিস ছিনিয়েও নেয়। ডাকাত পোষে সে জন্যে।'

জ্বলে উঠল ভ্যাম্পের চোখ। 'দেখো,' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখতে কষ্ট হচ্ছে তার, 'ছিনিয়ে নেব বলিনি আমি···'

'না, চুরি করতে এসেছিলেন আরকি দুপুরবেলা।'

'বেশি ফ্যাচফ্যাচ কোরো না, ছেলে। যা বলছি, শোনো। জানোয়ারগুলো বিক্রি করে দাও আমার কাছে।'

'কত দেবেন?'

'এক হাজার ডলার।'

মুচকি হাসল কিশোর। জবাব দিল না।

'দু-হাজার?'

'দশ হাজারেও না। বিশ হাজার দিতে যে কেউ রাজি হবে।'

'আর একটা আধলাও দেবো না। দুই, বাস।'

'পথ দেখতে পারেন তাহলে।'

'পস্তাবে, খোকা, এই বলে দিলাম। ভাল চাও তো দিয়ে দাও।'

শার্টের হাতা গুটিয়ে এগিয়ে এল মুসা। আরেক পাশ থেকে রবিনও এগোল, হাতে শটগান।

'ব্যাটাকে পানিতে ফেলে দেব?' কিশোরের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

ভ্যাম্পের লাল চোখ টকটকে হয়ে গেল। 'ইঁদুরের বাচ্চারা, দেখাব···' রাগে কথা ফুটছে না। 'দাঁড়া, দেখাব তোদের মজা! সোজা আঙুলে ঘি যখন উঠল না, বাঁকাই···'

থাবা দিয়ে রবিনের হাত থেকে শটগানটা ছিনিয়ে নিল মুসা। 'নামো। নইলে খোঁড়া হয়ে যাবে জন্মের মত।'

দুপদাপ করে নেমে গেল ভ্যাম্প। জনতার ভিড় ঠেলে হারিয়ে গেল ওপাশে।

নিচুস্বরে রবিন বলল, 'আবার আসবে। সকালের আগেই।'

'আমিও তাই ভাবছি,' কিশোর বলল। 'রাতেই আসবে। কিংবা আমাদের পিছু নেবে সকালে।'

'কি করব তাহলে?' মুসার প্রশ্ন।

'উপায় একটাই?'

'কী?'

'এগিয়ে থাকো। ভিড় সরে গেলেই নৌকা ছাড়ব। রাতের মধ্যেই এগিয়ে থাকব অনেকখানি। ভ্যাম্প রওনা হতে হতে অর্ধেক দিনের পথ এগিয়ে যাব আমরা।'

'কিন্তু আমরা যখন জানোয়ার ধরব, ওই সময় আবার এগিয়ে আসবে,' রবিন বলল।

'হারিয়ে যাব আমরা। খুঁজে পাবে না,' বলল কিশোর।

'মানে?'

'নদীটা কয়েক মাইল চওড়া, মাঝে ছোট-বড় অনেক দ্বীপ আছে। অসংখ্য খাল আছে ওগুলোর ভেতরে ভেতরে। কোন্‌টা দিয়ে আমরা ঢুকেছি, কোন দিকে গেছি, কি করে জানবে?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' মেনে নিল রবিন।

জিবাকে ডেকে বলল কিশোর, এক ঘণ্টার মধ্যেই রওনা দেবে। লোকজন যেন তৈরি রাখে।

'না না, সিনর,' প্রবল আপত্তি জানাল জিবা। 'সকালের আগে যাওয়া যাবে না।'

'আজ রাতে ঠিক দশটায় বজরা ছাড়ব,' সিদ্ধান্তে অটল রইল কিশোর।

'বিপদে পড়বে, সিনর। রাতে যাওয়া যাবে না।'

কিশোর বুঝল, অহমে লাগছে লোকটার। বয়স্ক, এদিককার নদী-বন সম্পর্কে অভিজ্ঞ। তাকে কিনা আদেশ দিচ্ছে এক পুঁচকে ছেলে। মানবে কেন?

কিন্তু জিবাকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার, কে মনিব। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে টাকা গুণলো কিশোর। বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও।'

'কি?'

'বিকেলে যে কাজ করেছ, তার টাকা। নিয়ে বিদেয় হও।'

হাঁ হয়ে গেল জিবা। বলে কি ছেলেটা? 'আমাকে ছাড়া যেতে পারবে না। এই নদীর কিচ্ছু চেনো না তুমি।'

'পারব পারব,' হাসল কিশোর। 'তোমাকে ছাড়া এতখানি যখন আসতে পেরেছি, যেতেও পারব।'

টাকা নিল না জিবা। গোমড়ামুখে বলল, 'রাত দশটায়ই রওনা দেব, সিনর।'

'ভেরি গুড।' টাকাটা আবার মানিব্যাগে রেখে দিল কিশোর।

জানোয়ার তোলা শেষ। দেখার আর কিছু নেই, একে একে চলে গেল সবাই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই একেবারে জনশূন্য হয়ে গেল ঘাট।

নিঃশব্দে নোঙর তুলল তিনটে নৌকা। ভেসে পড়ল আমাজনের স্রোতে। পেছনে পড়ে থাকল ভেলাটা, শূন্য, রিক্ত।

'ভ্যাম্প মিয়া ভেলা চেয়েছিল,' হেসে বলল মুসা। 'নিয়ে যাক এখন।'

মঞ্চে হাল ধরে দাঁড়িয়েছে জিবা। দাঁড় বাইছে চারজন ইনডিয়ান। একজনকে

সরিয়ে দিয়ে তার জায়গা নিল কিশোর। অধীনস্থদের বোঝানো দরকার, মনিবেরা কাজের লোক।

ছোট বজরায় গিয়ে দু-জন মাল্লার সঙ্গে দাঁড় টানায় যোগ দিল মুসা। রবিন গেল কফি বানাতে।

বড় বজরাটায় টলডোর ভেতরে রাখা হয়েছে জানোয়ারগুলোকে। খাঁচার ছাত থেকে চুপচাপ ঝুলে রয়েছে রক্তচাটা। বসে বসে ঝিমুচ্ছে ময়না, নৌকা জোরে দুললেই মৃদু কিচকিচ করে উঠছে। খানিক পর পরই এসে দরজার বাইরে নাক বের করছে নাকু, নৌকার দুলুনী ভাল লাগছে না তার। ভীতু ঘোড়ার বাচ্চার মত চিঁ চিঁ করে প্রতিবাদ জানিয়ে ফিরে যাচ্ছে আবার নিজের ঘাসপাতার বিছানায়। কুঁড়ের বাদশাহ ডাইনোসর একেবারে চুপ, পাটাতনে শুয়ে গভীর নিদ্রায় অচেতন। এক পায়ে ভর রেখে ঘরের কোণে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে লম্বু দার্শনিক, দুনিয়ার আর কোন খেয়ালই যেন নেই তার।

মাস্তুলে ঝুলছে চুলে বাঁধা কিকামু। তারার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ছে যেন আপনমনে।

আবছা অন্ধকার আকাশ থেকে যেন ঝুলে রয়েছে কৃষ্ণপক্ষের একটুকরো ক্ষয়া চাঁদ, ক্লান্ত, বিষণ্ণ। ভুতুড়ে হলদে আলো ছড়াচ্ছে, আঁধার তো কাটছেই না, কেমন যেন আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। চাঁদের দিকে তাকাতে সাহস করছে না মুসা, গা ছমছম করে। কিশোর দাঁড় টানায় এত ব্যস্ত, তাকানোর সময়ই নেই।

পাশের বন থেকে ভেসে এল রক্ত-জমাট-করা ভয়ানক গর্জন। না, টিগ্রে নয়। শুনে মনে হয় মরণযুদ্ধে মেতেছে একপাল ভয়াল নেকড়ে, কিংবা ভীষণ সিংহ। কিন্তু কিশোর জানে, নেকড়েও নয়, সিংহও নয়, ওটা এক জাতের বানরের ডাক। নিশার ফুরফুরে বাতাসে মাতোয়ারা হয়ে দরাজ গলায় গান ধরেছে ওটি কয়েক হাওলার মাংকি। সাধারণ কুকুরের চেয়ে বড় নয়, অথচ গলায় এত জোর, তিন মাইল দূর থেকেও শোনা যায় চিৎকার।

মানুষের স্নায়ুর ওপর খুব খারাপ প্রতিক্রিয়া করে ওই শব্দ। একজন নেচারালিস্ট-এর কথা মনে পড়ল কিশোরের। তিনি লিখেছেন ঃ

ডাকটা প্রথম যেদিন শুনলাম, মনে হলো, বনের ভেতরে মরিয়া হয়ে লড়াইয়ে মেতেছে আমাজনের সমস্ত জাগুয়ার।

তাঁর বিশ্বাস, হিংস্রতার দিক দিয়ে বেবুনের পরেই হাওলার মাংকি। এমনিতে মানুষকে ভয় করে, কিন্তু আক্রান্ত হলে ভয়ানক হয়ে ওঠে ওরা। চোয়ালে অসাধারণ জোর। একবার নাকি এক ভ্রমণকারীর শটগানের নল কামড় দিয়ে চ্যাপ্টা করে দিয়েছিল একটা হাওলার।

হাওলারের গর্জন থামলে কানে আসে হাজারো, লাখো ব্যাঙের কোলাহল। এরই মাঝে খুব আবছা শোনা যায় নিঃসঙ্গ কুমিরের কান্নার মত ডাক, শিংওলা পেঁচার তীক্ষ্ণ কর্কশ চিৎকার, তাপিরের হেষারব, পেকারির ঘোঁৎ-ঘোঁৎ। আরও নানা

সরিয়ে দিয়ে তার জায়গা নিল কিশোর। অধীনস্থদের বোঝানো দরকার, মনিবেরা কাজের লোক।

ছোট বজরায় গিয়ে দু-জন মাল্লার সঙ্গে দাঁড় টানায় যোগ দিল মুসা। রবিন গেল কফি বানাতে।

বড় বজরাটায় টলডোর ভেতরে রাখা হয়েছে জানোয়ারগুলোকে। খাঁচার ছাত থেকে চুপচাপ ঝুলে রয়েছে রক্তচাটা। বসে বসে ঝিমুচ্ছে ময়না, নৌকা জোরে দুললেই মৃদু কিচকিচ করে উঠছে। খানিক পর পরই এসে দরজার বাইরে নাক বের করছে নাকু, নৌকার দুলুনী ভাল লাগছে না তার। ভীতু ঘোড়ার বাচ্চার মত চিঁ চিঁ করে প্রতিবাদ জানিয়ে ফিরে যাচ্ছে আবার নিজের ঘাসপাতার বিছানায়। কুঁড়ের বাদশাহ ডাইনোসর একেবারে চুপ, পাটাতনে শুয়ে গভীর নিদ্রায় অচেতন। এক পায়ে ভর রেখে ঘরের কোণে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে লম্বু দার্শনিক, দুনিয়ার আর কোন খেয়ালই যেন নেই তার।

মাস্তুলে ঝুলছে চুলে বাঁধা কিকামু। তারার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ছে যেন আপনমনে।

আবছা অন্ধকার আকাশ থেকে যেন ঝুলে রয়েছে কৃষ্ণপক্ষের একটুকরো ক্ষয়া চাঁদ, ক্লান্ত, বিষণ্ণ। ভুতুড়ে হলদে আলো ছড়াচ্ছে, আঁধার তো কাটছেই না, কেমন যেন আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। চাঁদের দিকে তাকাতে সাহস করছে না মুসা, গা ছমছম করে। কিশোর দাঁড় টানায় এত ব্যস্ত, তাকানোর সময়ই নেই।

পাশের বন থেকে ভেসে এল রক্ত-জমাট-করা ভয়ানক গর্জন। না, টিগ্রে নয়। শুনে মনে হয় মরণযুদ্ধে মেতেছে একপাল ভয়াল নেকড়ে, কিংবা ভীষণ সিংহ। কিন্তু কিশোর জানে, নেকড়েও নয়, সিংহও নয়, ওটা এক জাতের বানরের ডাক। নিশার ফুরফুরে বাতাসে মাতোয়ারা হয়ে দরাজ গলায় গান ধরেছে ওটি কয়েক হাওলার মাংকি। সাধারণ কুকুরের চেয়ে বড় নয়, অথচ গলায় এত জোর, তিন মাইল দূর থেকেও শোনা যায় চিৎকার।

মানুষের স্নায়ুর ওপর খুব খারাপ প্রতিক্রিয়া করে ওই শব্দ। একজন নেচারালিস্ট-এর কথা মনে পড়ল কিশোরের। তিনি লিখেছেন ঃ

ডাকটা প্রথম যেদিন শুনলাম, মনে হলো, বনের ভেতরে মরিয়া হয়ে লড়াইয়ে মেতেছে আমাজনের সমস্ত জাগুয়ার।

তাঁর বিশ্বাস, হিংস্রতার দিক দিয়ে বেবুনের পরেই হাওলার মাংকি। এমনিতে মানুষকে ভয় করে, কিন্তু আক্রান্ত হলে ভয়ানক হয়ে ওঠে ওরা। চোয়ালে অসাধারণ জোর। একবার নাকি এক ভ্রমণকারীর শটগানের নল কামড় দিয়ে চ্যাপ্টা করে দিয়েছিল একটা হাওলার।

হাওলারের গর্জন থামলে কানে আসে হাজারো, লাখো ব্যাঙের কোলাহল। এরই মাঝে খুব আবছা শোনা যায় নিঃসঙ্গ কুমিরের কান্নার মত ডাক, শিংওলা পেঁচার তীক্ষ্ণ কর্কশ চিৎকার, তাপিরের হেষারব, পেকারির ঘোঁৎ-ঘোঁৎ। আরও নানা

ইলেকট্রিক বালবের মত ফোলা, ভেসে রয়েছে পানির ওপরে, বাকি শরীর পানির নিচে। লম্বা থুতনি বালিতে ঠেকানো।

পরিশ্রমে মাল্লারা সবাই ক্লান্ত, তিন গোয়েন্দারও শরীর ভেঙে আসছে। চোখে ঘুম।

পিপড়ে, জোঁক আর পোকামাকড়ের ভয়ে তীরে নামল না জিবা ও তিনজন ইনডিয়ান, ক্যানুর তলায় শুয়ে নাক ডাকাতে শুরু করল।

অন্যেরা ও'লো খালপাড়ের নরম বালিতে। শোয়া মাত্রই ঘুম, কিন্তু মুসা জেগে রইল। কুমিরটাকে দেখে দুষ্টবুদ্ধি মাথাচাড়া দিয়েছে তার।

—০—

তিন গোয়েন্দা সিরিজ

ভীষণ অরণ্য ১

রকিব হাসান

স্বীকারোক্তি:

বাংলা e-book-এর পাঠকেরা ছড়িয়ে আছেন বিশ্বের নানা প্রান্তে এবং সব জায়গার ইন্টারনেট কানেকশনের গতি সমান নয়। তাই চেষ্টা করতে হয়েছে ফাইলের সাইজ যথা সম্ভব ছোট রাখার। ফলে অনিবার্য ভাবে কমাতে হয়েছে ছবির Resolution. পাঠকের এই অসুবিধার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

Scanned by: Shabab Mustafa

Send your feedback at:
Shabab.mustafa@gmail.com